নির্মল হাসি

- এস.আই স্বপন

গত ঈদুল ফিতরের আগের ঘটনা। প্রাইভেট ফার্মের চাকরি আমার। ছুটি পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই গত দুই মাস ছুটির অভাবে বাড়ি যাওয়া হয়নি। বাসার সবাইকে মোবাইলে বলে রেখেছি, ঈদের ছুটিতে অবশ্যই আসবো।

বেশ কিছু দিন যাইনি বলে স্ত্রী অভিমান করে চিঠি দেয়া ও মোবাইলে ফোন করা বন্ধ করে দিয়েছে। চিন্তা করেছি, ঈদের ছুটিতে বাড়ি গিয়ে স্ত্রীর সব রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান ভাঙাবো।

বাড়ির সকলের জন্য সাধ্য মতো ঈদের কেনাকাটা করলাম। মায়ের জন্য শাড়ি। ছোট বোনের জন্য থ্রি পিস। ছোট ভাইয়ের জন্য শার্ট-প্যান্ট। বাবার জন্য পায়জামা-পাঞ্জাবি কেনার পর দেখলাম আমার বাজেটের টাকা প্রায় সবটাই শেষ। এখনো বৌয়ের জন্য শাড়ি কেনার বাকি। তারপরও অনেক কষ্ট করে সীমিত বাজেটে বৌয়ের জন্য মোটামুটি পছন্দসই একটি শাড়ি কিনলাম।

ঈদের কেনাকাটায় ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বইছে। কিন্তু আমার আনন্দ অন্যখানে। দীর্ঘ দুই মাস যাবৎ বাড়িতে যাই না। অথচ মনে হচ্ছে দুই যুগ ধরে যেন বাড়ির মানুষের সঙ্গে দেখা নেই। মায়ের হাতের রান্না, বৌয়ের হাতের গরম গরম চা থেকে যেন আমি বহুদিন ধরে বঞ্চিত।

শুধু মনে মনে ভাবি, কখন ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাবো, বাড়ির সবার সঙ্গে দেখা হবে আর বৌয়ের মান ভাঙাবো।

দেখতে দেখতে ছুটির সময় ঘনিয়ে এলো। আমার মতো অফিসের সকলেই সাধ্য মতো ঈদের কেনাকাটা করে পরিবার-পরিজন নিয়ে ঈদ করার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

ছুটির আগের দিন বিকেলে অফিসের বড় স্যার প্রতি ঈদের মতো সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তার রুমে ডাকলেন।

আমরা সকলে খুশি মনে স্যারের রুমে গেলাম।

স্যার সকলের উদ্দেশ্য বললেন, ঢাকা থেকে চিঠি এসেছে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে নিরাপত্তা প্রহরীসহ কমপক্ষে একজন কর্মকর্তাকে ছুটির সময়ে অফিসে অবস্থান করতে হবে।

কিন্তু অফিসে থাকার জন্য কাউকে কোনো ভাবে স্যার রাজি করাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত স্যার সবার ওপর প্রচণ্ড রাগ করলেন। উপায় না দেখে এক রকম জোর করেই আমার ওপর অফিসে থাকার দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন।

ওই পরিস্থিতিতে আমার কিছুই করার ছিল না। মনে মনে খুব কষ্ট পেলাম। মুখে কিছুই বললাম না। মনে এতো বড় আঘাত আর কোনোদিন পেয়েছি কি না জানি না।

আস্তে করে বিনাবাক্যে স্যারের রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। বাড়ির সবার মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মায়ের করুণ মুখ, বৌয়ের অভিমানী চাহনি, ছোট ভাই-বোনদের নতুন কাপড়ের জন্য অধীর আগ্রহে পথের পানে তাকানো ইত্যাদি আমার কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক বলে মনে হলো।

কতোক্ষণ চেয়ারে বসেছিলাম মনে নেই। শুধু দেখলাম অফিসের সব কলিগরা খুশি মনে বাড়ি চলে যাচ্ছে।

কখন যে সন্ধ্যা হলো খেয়াল করতে পারলাম না।

অফিস পিয়নটা এসে চা দিয়ে বললো, স্যার, সন্ধ্যা হয়েছে, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসেন। ভালো লাগবে।

অফিস থেকে বের হয়ে মোবাইল ফোনে জানিয়ে দিলাম ঈদে আসতে পারবো না।

খবর পেয়ে বাসার সবার মন খারাপ হয়ে গেল এবং ঈদের আনন্দ যেন মাটি হয়ে গেল।

খারাপ লাগবে বিধায় বেশিক্ষণ কথা বলিনি। লাইন কেটে দিলাম।

ঈদের আগের দিন বিকেলবেলা অফিসের সিকিউরিটি গার্ড এসে আমাকে বললো, স্যার, ভাবী সাহেবা অর্থাৎ আমাদের স্যারের স্ত্রী আপনাকে এখনি বাসায় যেতে বলেছেন।

মন খুব খারাপ থাকায় সন্ধ্যার পর আস্তে আস্তে স্যারের বাসায় গেলাম। বাসায় গিয়ে স্যার বা ভাবীকে পেলাম না।

আধঘণ্টা পর ভাবী বাসায় এলেন। বললেন, এতো দেরি করলেন কেন, আপনার জন্য অপেক্ষা করে আমি বাইরে গিয়েছিলাম।

ভাবী বসলেন আমার সামনে। জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়ি যাবেন না?

ছুটি পাইনি। তাই যেতে পারিনি।

আপনি কি এখনি বাড়ি যেতে পারবেন? আপনার স্যারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আপনি এখনি বাড়ি চলে যান।

ভাবীর কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লাম। এই রকম অপ্রত্যাশিত খবরের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। খুশিতে আমার চোখে পানি এসে গেল। ভাবীকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিলাম আমি আসছি। তবে রাত দেড়টা দুইটা বাজতে পারে।

তখন আমার এমন অবস্থা যে, পারলে উড়াল দিয়ে চাদপুর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়ে পৌছি। রাত তখন নয়টা বাজে। তাড়াহুড়ো করে বাসস্ট্যান্ডে গেলাম। কোনো বাস পেলাম না। তাই চট্টগ্রামগামী একটি ট্রাকে উঠে কুমিল্লার পদুয়ার বাজার নামলাম। তখন রাত সাড়ে এগারোটা বাজে।

ঈদের আগের রাত, তাই এখানে অনেক মানুষের ভিড়। কিন্তু কোনো বাস পেলাম না। উপায় না পেয়ে রিকশায় কুমিল্লা রেল স্টেশনে চলে এলাম। কুমিল্লা থেকে আন্তঃনগর *তূর্ণা নিশীথ*-এ রাত আড়াইটায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে নামলাম।

রিকশা করে বাসার সামনে এসে নেমে দোতলায় আমার রুমের দিকে তাকিয়ে দেখি ডিম লাইট জ্বালানো এবং প্রিয়তমা স্ত্রী না ঘুমিয়ে জানালার পাশে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আমার আসার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে।

গেট দিয়ে দোতলায় উঠে দেখি দরজা খোলা। আস্তে করে চাপ দিয়ে দরজা খুলেই দেখি, প্রিয়তমা স্ত্রী। সে এমন একটি প্রাপ্তির হাসি দিয়ে আমাকে স্বাগত জানালো যে, আমার সকল দুঃখ-কষ্ট-ক্লান্তি যেন মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

আমি কতো দিন পরে বৌয়ের কাছ থেকে এমন নির্মল হাসি উপহার পেয়েছি তা মনে করতে পারলাম না।

চাদপুর থেকে

ওয়াকম্যান

- আল ফাত্তাহ বিন মমতাজ দিতু

২০০০ সালের ঘটনা। সবে বৃত্তি পরীক্ষা শেষ করেছি। সামনে ঈদ। তাই নতুন কিছু কেনার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলাম। কিন্তু আমার আব্বা অসুস্থ থাকায় জানিয়ে দেয়া হলো, এবার ঈদে কোনো কিছু কেনা হবে না।

এরই মধ্যে আমার বন্ধুদের মাঝে পোশাকের পরিবর্তে ওয়াকম্যান কেনার প্রতিযোগিতা শুরু হলো, কে কতো ভালো ওয়াকম্যান কিনতে পারে।

ফ্রেন্ডদের চ্যালেঞ্জ করলাম, তাদের চেয়ে ভালো ওয়াকম্যান কিনবো। একটা ওয়াকম্যানের স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলাম।

একদিন আম্মাকে বললাম, এবার ঈদে কিছু চাই না, শুধু একটা ওয়াকম্যান কিনে দাও।

আম্মা বললেন, আগামী ঈদে কিনে দেবো, তোমার বাবার অপারেশনের ঝামেলা শেষ হোক।

আমাদের ময়মনসিংহ শহরে ভালো ওয়াকম্যান পাওয়া যায় না। তারপরও এক দোকানে সনির একটি ওয়াকম্যান দেখলাম যার দাম এক হাজার তিনশ টাকা। আবার বাসায় এসে আম্মাকে বললাম।

আম্মা এবার খেপে গেলেন এবং খুব বকুনি দিলেন।

মন খারাপ করে বসে আছি। বন্ধুরা টিটকারী করছে।

আর মাত্র দুই দিন পরে ঈদ। ঠিক এমন সময় আম্মা আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, সামান্য একটা ওয়াকম্যানের জন্য এতো নিরাশ হয়ে গেলি?

মা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এক হাজার তিনশ টাকা দিলেন এবং বললেন, ভালো করে দেখেশুনে যেন কিনি।

টাকা পাওয়ামাত্রই আনন্দে কেদে ফেললাম। তারপর সনির সেই ওয়াকম্যানটা কিনে আনলাম। বন্ধুদের দেখিয়ে নিজের স্বপ্ন পূরণের আনন্দ উপভোগ করলাম।

ময়মনসিংহ থেকে

শেষ বিদায়

– এম.এস.এইচ সেলিম

সকাল সাড়ে পাচটা। আমরা দুই বন্ধু নিউ মার্কেটের সামনের রাস্তা দিয়ে হাটছি। শীতের সকালে রাস্তা দিয়ে হাটলেও নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়। বিশাল রাস্তায় গুটিকয়েক লোক ছাড়া কোনো কিছু চোখে পড়ে না। লোকগুলোর হাটার ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, পেছন থেকে হয়তো তাদের সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগার আক্রমণ করেছে। তা না হলে সুন্দরী বৌ বাড়িতে রেখে এসেছে। হঠাৎ দেখতে ইচ্ছা করলো, তাই বাড়ির উদ্দেশ্যে জোরে হাটা।

আমরা দুজনও বিশাল দূরত্বে রাস্তায় পা বাড়াচ্ছি। তবে আমাদের হাটার উদ্দেশ্যটা একটু ভিন্ন রকম। আমাকে একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

সময় দেয়া ছিল সাড়ে পাচটা নিউ মার্কেটের সামনে দেখা হবে। কিন্তু ঘড়ির কাটায় চোখ রেখে দেখি দশ মিনিট ওভার হয়ে গেছে। তার কোনো খবর নেই।

আমি অপেক্ষা করতে চাইলেও আমার বন্ধু কিছুতেই অপেক্ষা করবে না।

দোস্ত, অনেক হয়েছে, এবার চলো।

আরেকটু দেখি, সে যদি আসে!

তুই থাক, আমি চললাম। বলেই সে খালি, এই খালি বলে চিৎকার শুরু করে দিল।

দূর থেকে দেখতে পেলাম, তিনটি মেয়ে আমাদের এদিকে আসছে।

দোস্ত, এদের মধ্যে কেউ হবে। আমার বন্ধু এমনভাবে কথাটা বললো যেন এই মুহূর্তে সে এভারেস্ট জয় করে এসেছে। আরে শালা, তুই দেখ। আমি শতকরা একশ ভাগ গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, এদের মধ্যে কেউ হবে।

নিরীহ ভঙ্গিতে বললাম, না রে, এদের মধ্যে কেউ নয়। কারণ তার একাই আসার কথা ছিল।

তাদের কথা বলতে বলতে তারা আমাদের সামনে দিয়ে গাংচিলের মতো ছো মেরে হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমার বন্ধু এতিমের মতো কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থেকে থম মেরে রিকশায় চেপে বসলো।

আমার আর কি করা? তার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও তাই করতে হলো।

এই সেলিম!

কে যেন পেছন থেকে আমার নাম ধরে ডাকলো। ভাবলাম এই মুহূর্তে যে তিনজন মেয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল তাদের কেউ হবে।

ঘাড় বাকিয়ে পেছনের দিকে তাকালাম। ধারণা মিথ্যা নয়, সত্যি সত্যি তাদের মধ্যে থেকে ডাকটা এসেছে। কিন্তু কে যে ডাকটা দিয়েছে সেটা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছি না।

রিকশা থেকে নেমে রিকশাচালককে বললাম, ভাই, আপনি যান। আমাদের একটু দেরি হবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলে থেকে যান।

রিকশাচালক তার লুঙ্গির ভাজ থেকে একটা ধূমদণ্ড বের করে টানতে টানতে বললো, আমি যাই।

রিকশাচালকের চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে সে বলতে চায়, *শালারা তোরা যাবি মাইয়্যা মানুষের লগে টাংকি মারতে, আর আমি ন্যাড়া বিড়ালের মতো চাইয়া চাইয়া দেখুম। তা হয় না।*

কি যেন মনে করে কথাটা বললো না।

এতোক্ষণ যে মেয়েটির কথা বললাম তার নাম মৌসুমী। মৌসুমীর সঙ্গে আমার পরিচয়ের ধারাটা একটু ভিন্ন রকম।

কলেজ জীবনের দেড় বছরে পা দিয়েছি। আর এই দেড় বছরে যে কতো অকাম–কুকাম করেছি! হিসাবের খাতা খুললে দেখা যাবে শয়তানের ওপর আমার নিবাস।

একদিন দুষ্টামির ছলে কলেজ থেকে একটা চিঠি তুলে আনি। চিঠি পড়ে বুঝতে পারলাম প্রেরকের একজন ভালো বন্ধু দরকার। প্রেরক যাকে বন্ধু হিসেবে পেতে চায়, তাকে হটিয়ে দিয়ে তার স্থান দখল করে প্রেরকের ঠিকানায় চিঠি লিখি। কিছু দিন পর চিঠির উত্তর আসে। এভাবে চিঠি আদান–প্রদানের পর প্রেরকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গভীর হয়। এ প্রেরকের নামই হচ্ছে মৌসুমী।

যে কথা বলছিলাম। মেয়ে তিনটির মধ্যে থেকে মৌসুমীকে চেনা দুরূহ ছিল। কারণ মৌসুমীর সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যেটাই হোক না কেন, আগে কখনো হয়নি। শুধু চিঠির মাধ্যমে যেটুকু ভাব আদান–প্রদান হয়েছে এটুকুই।

দুদলই যখন মুখোমুখি দাড়ালাম, কারোও মুখে কোনো কথা নেই। মনে হচ্ছে, বিধাতা আমাদের সবার মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েছে। কথা বলার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও কিছুতেই কথা বলতে দেবে না।

সকল বাধা পিছে রেখে তাদের একজন বললো, তোমাদের মধ্যে সেলিম কে?

তাদেরকে বোকা বানানোর জন্য আমার বন্ধুকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম, তার নাম সেলিম।

এবার আমার প্রশ্ন, তোমাদের মধ্যে মৌসুমী কে?

একজনের জবাব এলো, এর নাম মৌসুমী।

যাকে মৌসুমী নামে পরিচয় দিল তার গায়ে লাল জামা পরা ছিল।

অবশ্য মৌসুমীর সঙ্গে আমার শর্ত ছিল। তাকে চিনতে যেন কোনো ফ্যাসাদে পড়তে না হয় সে জন্য লাল জামা পরে আসবে। সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে নিলাম, লাল জামা পরা মেয়েটাই মৌসুমী হবে।

রাস্তায় দাড়িয়ে বেশিক্ষণ গল্প করা ভালো দেখায় না। নানান কিসিমের মানুষ ঘোরে রাস্তায়। কে কি মনে করে বোঝা কঠিন। তাছাড়া হাতেও সময় নেই। বিশ মিনিটের মধ্যে কথার ঝুলি ফাকা করতে হবে। কারণ সকাল ছয়টায় আমাদের আসল গন্তব্যস্থানে পৌছার ট্রেন ছাড়বে।

সময় সংকীর্ণতার জন্যে দুদলেই রিকশায় উঠলাম স্টেশনের উদ্দেশ্যে। স্টেশনে এসে হাতে সময় সাত আট মিনিট। এই সময়ে মৌসুমীকে যা বলার ছিল তার চেয়ে অনেক কিছু বললাম। বামে ঘুরে দেখি আমার বন্ধু তাদের দলের আরেক জনের সঙ্গে কথা বলছে তো বলছেই।

ট্রেন প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। মৌসুমীকে আমার আসল পরিচয় দিতে গিয়ে বললাম, আসলে আমিই সেলিম। যাকে আমার পরিচয়ে তোমার সামনে পরিচিত করেছি সে আমার বন্ধু শাহিন।

সঙ্গে সঙ্গে সেও বললো, আচ্ছা, আপনি এতো বোকা কেন? আমি যদি মৌসুমী হতাম, আপনি সেলিম না, এটা জেনেও কি আপনার সঙ্গে এতো সময় ধরে কথা বলতাম! নিশ্চয়ই না।

এতোক্ষণে বুঝতে পারলাম তাকে বোকা বানাতে গিয়ে নিজেও বোকা সেজে বসে আছি।

এদিকে শাহিনের মুখেও একই কথা, আমি সেলিম না। আপনার বান্ধবী যার সঙ্গে কথা বলছে সেই সেলিম।

যে মুহূর্তে সত্যটা প্রকাশ পেল তখন আমাদের মধ্যে কথা বলার কোনো সুযোগ ছিল না। শুধু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। তারপর এক দৌড়ে ট্রেনে যাওয়া।

ব্যাপারটা হাস্যকর হলেও আমার কাছে বেদনাদায়ক হয়ে দাড়ালো। কারণ মৌসুমীর সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে, সামনাসামনি কথা হবে বলে মনে হয় না। এই যে, এখান থেকে যাচ্ছি, কোনোদিন এখানে আসবো কি না সন্দেহ হয়।

আর্তনাদগুলোকে বুকের মধ্যে চেপে রেখে ট্রেনের দরজার কাছে দাড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে চোখ রাখলাম।

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি মৌসুমী হাত নাড়িয়ে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে।

বোকার মতো দাড়িয়ে থেকে তার হাত নাড়া দেখছি।

আমি তো ভুলেই গিয়েছি। আমাকেও হাত নাড়িয়ে তার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতে হবে। আস্তে আস্তে সে আমার চোখের আড়াল হয়ে গেল। আমার আর শেষ বিদায় নেয়া হলো না।

শেষ বিদায় না নিয়ে ভালোই করেছি। চাই না আমাদের বন্ধুত্বের মাঝে শেষ বলে কিছু থাকুক। যতোদিন আকাশে সূর্য উঠবে, যতোদিন চাদ আলো দিয়ে যাবে ঠিক ততোদিন যেন আমাদের বন্ধুত্ব টিকে থাকে।

নীলফামারী থেকে

জমিরউদ্দিন সরওয়ার্দি

স্বপ্নের শহর মন্ট্রিঅলে পদার্পণ করেই মুখোমুখি হলাম মাইনাস একচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার। দেশে থাকাকালে এই মাইনাস তাপমাত্রা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকলেও ছিল না কোনো শারীরিক অভিজ্ঞতা। এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে গিয়ে মনে হলো আমার প্রশ্বাস ভেতরের সব কলকব্জাগুলোকে নেই করে দিচ্ছে। নাকের ফুটো ছাড়া আপাদমস্তক গরম কাপড়ে আবৃত করেও কিছুক্ষণ হাটার পর মনে হলো, আমি কি মরে যাবো? না, দেখি ধীরে ধীরে বেচে উঠছি আমি। এবং বেচে গেলাম একটা রোগ থেকেও।

প্রতি বছর শীত এলে বিশেষ করে পৌষ ও মাঘ মাসে ঢাকায় ধুলো, কালো ধোয়ার অবদানে যে শ্বাসকষ্টে ভুগতাম, এখানে হাড্ডি কামড়ানো শীতেও তার দেখা পেলাম না। অবশ্য শহরটা ঘুরে আপসেটই হলাম। কারণ আসার আগে কল্পনার মানসপটে যে মন্ট্রিঅলের ছবি একেছিলাম, বাস্তব মন্ট্রিঅল তার থেকে অনেক দরিদ্র। তবে অনেক পুরনো শহর এই মন্ট্রিঅল। আধুনিক শহরের সকল সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দীনতাগুলো বড্ড চোখে লাগে।

সিনিয়র ভাইয়েরা বললেন, প্রথম প্রথম সবার কাছে এমনই লাগে। পরে আপন হয়ে যায়।

চারদিকে এতো বেশি এশিয়ান, বিশেষ করে অনেক বড় বাংলাদেশি কমিউনিটিতে মেশার পর মনে হয় ঢাকায় বসে বসে আড্ডা দিচ্ছি। এখানে মাতৃভাষার সবচেয়ে বড় সুবিধাটা হলো পথে-ঘাটে বাংলাদেশি বন্ধুর সঙ্গে যাচ্ছেতাই আলাপ করা যায়। কোনো কিছু ভালো না ঠেকলে মুখে যা আসে তা-ই বলা যায় এ স্বাধীনতা অন্তত দেশে ছিল না। এভাবেই অভ্যস্ত হতে লাগলাম নতুন জায়গায়।

প্রথম দিন ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পথে সাবওয়ে স্টপেজ-এ দেখা মিললো এক রাজকীয় ভিক্ষুকের। পায়ে নতুন কেডস, চোখে দামি সানগ্লাস, বুকে সাইনবোর্ড Vietnam veteran. Please help.

মনে পড়লো কোনো একটা বাংলা নাটকে দেখেছিলাম ২০১৫ সালে বাংলাদেশে ভিক্ষুকদের সুরত কেমন হবে, অনেকটা সেই রকম। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত লোকগুলো কর্মক্ষম। কিন্তু অলস। সরকারের কাছ থেকে যা ওয়েলফেয়ার ভাতা পায় তা দিয়ে থাকা-খাওয়া চললেও মদের পয়সা থাকে না। তাই এরা ভিক্ষা করে। বলা যায় *রাজকীয় কপাল* এদের। আমার দেশের মানুষ ভিক্ষা করে ভাতও পায় না, আর এরা খায় মদ।

যাক, শুরু করলাম আবার ছাত্র জীবন। দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে কিছুটা রোবটিক লাইফে অভ্যস্ত হলেও এখানে এসে পুরোপুরি মেশিন হয়ে গেছি। দুই মাস পর খানিকটা বিনোদনের সুযোগ পেলাম। ডিপার্টমেন্ট থেকে অটোয়া গেলাম উইনটার ফেস্টিভালে। সঙ্গে অনেক পরিচিত ভাই-ভাবী, বন্ধুরা। এবার মনে হলো রিয়াল কানাডায় এসেছি। অটোয়া ছবির মতো সুন্দর। শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বয়ে গেছে একটা চওড়া খাল। শীতকালে যেটা এখানকার সবচেয়ে বড় আইস স্কেটিং গ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাত আট বছরের ছেলে মেয়ে থেকে পয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছরের বুড়ো-বুড়িরাও স্কেটিংয়ে মগ্ন।

নিতান্ত শখের বসে এক বন্ধু বিশ ডলার দিয়ে এক জোড়া স্কেটিং শু ভাড়া করে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু দাড়ানোর আগেই পড়ে গেল। একটু ওঠে আবার বসে পড়ে ভয়ে। এভাবে আধঘণ্টা চেষ্টা করেও দাড়াতেই পারেনি, স্কেটিং তো অনেক দূর।

তার অবস্থা দেখে আমরা তো বটেই, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও হাসতে হাসতে বিষম খেল।

যা শালা, বিশ ডলার আইস-এ গেল!

দেখতে দেখতে এসে গেল সামার। আমাদের দেশের মতো এ দেশেও প্রকৃতির হাসি ফোটে। গাছপালাগুলো লতাপাতার পোশাক পরিধান করতে লাগলেও মেয়েরা পোশাক খোলা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। মনে হয় পোশাক যতো কম খরচ করা যায় ফেডারাল রিজার্ভ ততোই বাড়বে। তাই এই প্রতিযোগিতা।

সামারে ভালো আবহাওয়ার পাশাপাশি অনেকগুলো আয়োজন। পর্যটকের ভিড় বাড়িয়ে দেয়। প্রথমেই আসে ফায়ার ওয়ার্কস বা আতশবাজির কথা। বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণে প্রায় দুই মাস ধরে প্রতি শনিবার রাত দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত আধ ঘণ্টায় কয়েক মিলিয়ন ডলার পোড়ানো হয় আতশবাজিতে। দেখতে খুবই মনোরম লাগলেও হঠাৎ মনে পড়ে যায় আমাদের উত্তরবঙ্গের মঙ্গায় কষ্ট করা ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর চেহারা। তখন আর ভালো লাগে না। তবে এখানকার মোটর রেস, মিউজিক ফেস্টিভালগুলো সত্যিই উপভোগ করার মতো। মিউজিক ফেস্টিভালে গেলে বোঝা যায়, পৃথিবীর সকল ভাষার সুরের আবেদন সার্বজনীন। বিশেষ করে ল্যাটিন কিছু গান ও সুরের তুলনাই হয় না। এতো আনন্দের পাশাপাশি কিছু যন্ত্রণাও উল্লেখ করার মতো। প্রথমেই আসে কুকুরের যন্ত্রণা। এ সময় পথে-ঘাটে সব জায়গায়, সব বয়সী নারী-পুরুষ রশি হাতে কুকুর নিয়ে হাটতে বের হয়।

আমাদের দেশে বিকেলবেলায় মানুষ যেমন গরু-ছাগল চড়ায় সে রকম করেই এরা কুকুর চড়ায়। যারা নামাজ কলেমা করে তারা সব সময় দশ হাত দূর দিয়ে হাটে। কারণ ক্রস করার সময় এগুলো মানুষের কাপড়-চোপড় শুকে, লেহন করে বেড়ায়। অনেক সময় আমরা ফুটপাথ থেকে নেমে গিয়ে সাইড দিয়ে দিই। কেননা এখানে কুকুরকেও কিছু বলা যাবে না। তাদেরও অনেক অধিকার। অবশ্য অধিকারের দিক দিয়ে এ দেশে আমার কাছে মনে হয় প্রথম স্থান শিশুর, তারপর নারীর, অতঃপর কুকুরের। সর্বশেষ পুরুষ মানুষের।

এখানে পুরুষ মানুষরা সবচেয়ে অসহায়। আরো দুই শ্রেণীর অধিকারও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। গে (Gay) বা পুরুষ সমকামী এবং লেসবিয়ান বা নারী সমকামী। এই সমকামী সম্পর্ককে তারা লুকিয়ে রাখে না। সামারে এরা ওপেন প্যারেড করে। কয়েক সপ্তাহ আগে এ রকম একটা প্যারেডের আয়োজন করা হয়েছিল ইউনিভার্সিটি এলাকায়। যথানিয়মে নিমন্ত্রণও পেয়েছিলাম। কিন্তু এদের সম্পর্কে চিন্তা করতেই গা কেমন করে

ওঠে। প্যারেড দেখা তো অনেক দূরের ব্যাপার। এদেরও স্কলারশিপ–এর ব্যবস্থা আছে! এটা শুনতে অনেকের কাছে অবাক লাগারই কথা।

সর্বশেষ ৫ সেপ্টেম্বরে গেলাম থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস–এ। Thousand Islands. গ্র্যাজুয়েট এসোসিয়েশন থেকে আয়োজন করা হয়েছিল এই ভ্রমণের। অনেক বাঙালি পরিবারসহ গেলাম ওই ঐতিহাসিক স্পটে যেখানে এক হাজারেরও বেশি দ্বীপ আমেরিকা আর কানাডায় ভাগাভাগি করে প্রকৃতির রঙ ধারণ করে শুয়ে আছে। সেন্ট লরেন্ট নদীর বুকে। এই সেন্ট লরেন্ট নদীটা কয়েকটা শহর বয়ে এ জায়গায় আটলান্টিকের সঙ্গে মিশে গেছে। তাই এখানে এটা খুবই প্রশস্ত এবং গভীর। অষ্টদশ শতকে ইংরেজদের গড়া ফোর্ট হেনরি থেকে শুরু হলো আমাদের প্রায় চার ঘণ্টার ক্রুজিং। ভাষ্যকাররা ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় বর্ণনা করলেন দুই পাশের দ্বীপগুলোর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বিশেষ করে বৃটেন বনাম ফ্রান্স, বৃটেন বনাম আমেরিকা যুদ্ধকালীন বিভিন্ন ঘটনা যা আজও দ্বীপগুলো সাক্ষী হিসেবে বহন করে চলছে। কিছু কিছু দ্বীপ একেবারেই ছোট। মাত্র কয়েক কাঠা হবে। অনেক কবি–সাহিত্যিক, শৌখিন জেলে এগুলোর মধ্যে বাড়ি করে পানি আর মাছের সঙ্গে বসবাস করে যাচ্ছেন। প্রথম দেড় দুই ঘণ্টা ভালোই কাটলো। এরপর মনে হতে লাগলো আরিচা–দৌলতদিয়া রুটের ফেরিতে বসে তীরের অপেক্ষা করছি।

ক্রুজিং শেষে গেলাম ফোর্ট হেনরির ভেতরে। অনেক বয়স সত্ত্বেও দুর্গটা এখনো সুরক্ষিত। প্রতি সামারে বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্রছাত্রীসহ অনেকেই টুরে এখানে আসে। তাই কর্তৃপক্ষও বিভিন্ন মহড়ার আয়োজন করে থাকে। দূর্গের ভেতরকার সৈন্যদের স্টেটাস অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাগুলো দেখার পাশাপাশি মহড়ায় শত্রুর বিপক্ষে কামান দাগানো দেখে অনেকটা আবেগ আপ্লুত হয়ে গেলাম।

অবশেষে ফেরার পথে দেখতে পেলাম একটা স্টেডিয়ামে গ্যালারি ভর্তি মানুষ অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বাস্কেটবল খেলা দেখছে যা দেখে আমার মনে পড়ে গেল জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলা দেখার একটা স্মৃতি কথা।

তখন ১৯৯২–৯৩ মরসুম। থাকতাম আরামবাগে। *মা ও মণি গোল্ড কাপ* খেলার দেখার জন্য গেলাম এক নাম্বার জাতীয় স্টেডিয়ামে যা এখন *বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম* নামে পরিচিত। ফেনী বনাম টাঙ্গাইলের খেলা। আমরা ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম বাসিন্দারা ফেনীর পক্ষে এবং টাঙ্গাইল, ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের লোকজন টাঙ্গাইলের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আগে থেকেই দুই গ্যালারিতে বিভক্ত হয়ে বসে আছি। অনেকটা তখনকার আবাহনী মোহামেডান সমর্থকদের মতো।

প্রথম হাফ ভালোই কাটলো এক–এক গোল নিয়ে। শেষ হাফের শেষ দিকে ফেনী আরেকটা গোল করলেই গোলমাল বেধে গেল। টাঙ্গাইলের দাবি ছিল ওটা অফসাইড। মাঠে খেলোয়াড় বনাম খেলোয়াড় কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতিতে পৌছালো। কিছুক্ষণের মধ্যে এটা বিস্তার করলো গ্যালারিতে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি অন্য গ্যালারি থেকে ইটের টুকরো এসে পড়ছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই গ্যালারি থেকেও অনেকে প্রত্যুত্তর দিচ্ছে। এরপরই দেখলাম উড়ে আসছে বাশ।

সদ্য এসএসসি পাস করে ঢাকায় আসা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হলো না এতো ইট, বাশ এতো অল্প সময়ে তারা কোত্থেকে যোগাড় করলো। মনে হয় আগে থেকেই খেলা দেখার এ রকম প্রস্তুতি নিয়ে বসেছিল সবাই। এতেই শেষ নয়। কিছু সময় পর দেখি পলিথিন ভর্তি পানি এসে পড়ছে সামনে এবং ফেটে ছিটকে পড়ছে গায়ে। আরে, এতো পানি না, ইউরিন! এখান থেকেও অনেকে পলিথিনে প্রস্রাব করে নিক্ষেপ করছে ওই দিকে।

ততোক্ষণে মাঠে খেলা শেষ হয়ে গেলেও গ্যালারির খেলা শেষ না হয়ে আরো তীব্রতর হতে লাগলো। অবশেষে দিলাম ভোদৌড়। জীবনে এই প্রথম এতো উচু কাটাতারের ব্যারিকেড পার হয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে পালালাম। বাইরে এসে ভাবলাম রক্ষা। কিন্তু না, ততোক্ষণে রাস্তায় শুরু হয়ে গেছে গাড়ি ভাংচুর,

দৌড়াদৌড়ি। কোন রাস্তা থেকে কোন রাস্তায় যাবো দিক পেলাম না। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা লাগলো স্টেডিয়াম থেকে আরামবাগ আসতে। তওবা করলাম আর জীবনে স্টেডিয়ামে যাবো না। অবশ্য এখন আমাদের দেশে খেলা দেখায় গণ্ডগোল তেমন চোখে পড়ে না। খেলার গতি সেখানে নিম্নমুখী। দর্শকদের উত্তেজনার গতিও সেই পথ অনুসরণ করে চলছে।

যদিও এখন এই উত্তেজনা, মারামারি, হানাহানি, অস্থিরতা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি তবুও মনে হয়, সেই জন্মভূমিতে রয়েছে আমার সকল সুখ, সর্বসত্তা।

মন্ট্রিঅল, কানাডা থেকে
soroardyjuca@yahoo.com

উচিত সাজা

- ইনাবুল জান্নাত লিয়া

ফরিদা নামে আমাদের কাজের মেয়েটির গত কয়েক বছর আগে ঈদুল ফিতরে নাটকীয়ভাবে দ্বিতীয়বারের মতো শুভ বিয়ে সম্পন্ন হয়।

ফরিদার বয়স অল্প রেখেই তার মা মারা যান, সেই সঙ্গে বাবা নিরুদ্দেশ হন। হয়তো তিনি অন্য কোনো জেলায় বিয়ে করে আরেক ফরিদার জন্ম দিয়ে পূর্ব ফরিদাকে ভুলে থাকতে পারছেন।

ফরিদাকে তার খালার বাসায় কিছু দিন থাকার পর আমাদের বাসায় আম্মার হাতের কাজের সাহায্যকারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ফরিদার জন্য এই আবাসস্থলটি অতি মানানসই বলে একটানা আট বছর টিকে থাকা তার জন্য সহজ হয়েছিল।

ফরিদার বিয়ের বয়স আসন্ন। তার খালার চেয়ে আমাদের চিন্তা কম নয়। উপযুক্ত ছেলে পেলে ঘরজামাই করে গ্রামের বাড়িতে রেখে দেয়াই আমাদের ইচ্ছা। কিন্তু সে রকম বিশ্বস্ত কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে বিয়ের কাজ দেরি হচ্ছিলো। তবে আমাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে তার খালা বিয়ে ঠিক করে মেয়ে নিতে এলেন। আমরা প্রথমে আপত্তি জানালেও ছেলে কর্মঠ এবং কোনো প্রকার যৌতুক চায় না শুনে আব্বা-আম্মাসহ বাসার সবাই রাজি হলাম।

বিয়েতে যা খরচপাতি দরকার তা বাবদ আব্বা বেশ কিছু টাকা মেয়ের খালার কাছে তুলে দিলেন এবং বললেন, বিয়ের পর যেন ছেলেকে নিয়ে ফরিদা আমাদের বাসায় বেড়াতে আসে। ছেলে যদি পছন্দ হয় তাহলে গ্রামের বাড়ি দেখাশোনার জন্য তাকে রেখে দেয়া হবে। বাড়িতে যতো প্রকার জীবিকা নির্বাহ সুযোগ সুবিধা আছে তার পর্যাপ্ত পরিমাণে তারা ভোগ করতে পারবে।

এই ঘটনার মাস খানেক পর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তার খালা বিষণ্ণ মুখে আমাদের এখানে উপস্থিত।

জামাই কোথায় জিজ্ঞাসা করতেই মেয়ে-খালা দুজনেই হাউমাউ করে কান্না শুরু করলো। কান্না থামানো দায়।

কি ব্যাপার, কি ঘটনা তা উদ্ধার সহজ হচ্ছে না দেখে আব্বা এক প্রকার ভয়ংকর ধমক দিলেন।

তাতে কাজ হলো। কান্না একটি নিরাপদ মানে পৌছালো।

তাদের বক্তব্য থেকে বোঝা গেল, ছেলে (জামাই) পূর্ব থেকেই বহু বিয়ের মালিক। সেসব বিয়ে এক মাস, দুই মাস, বড়জোর ছয় মাসের বেশি টেকেনি।

বিয়ের আগে মেয়ের খালা শুধু জেনেছিল ছেলে দুটি বিয়ে করেছিল। প্রথম বৌ মরে যাওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করে সেই বৌয়ের সঙ্গে মনের মিল না হওয়াতে তাকে ছেড়ে ফরিদার সন্ধান পায়। ফরিদার পজিশন তিন নাম্বার, মন্দ কি! ছেলে কর্মঠ সেটাই আসল কথা। কিন্তু এখন তার খালা লোক মুখে শুনে এসেছেন, ওই ভদ্র জামাইয়ের কাজই হচ্ছে বিয়ে করা আর ছাড়া।

সব শুনে বুঝতে পারলাম, কুমারী মেয়েদের কুমারিত্ব ছিনিয়ে নেয়া পর্যন্তই তার আগ্রহ। ফরিদার খালার ওপর রেগে তার চোদ্দ গোষ্ঠির মুর্খতার ফিরিস্তি ঝাড়লেন আব্বা। এবং ফরিদার স্বামীর ওপরও এক হাত নেবেন বলে দিলেন তিনি। আব্বা জানতে চাইলেন কাবিন কতো দেয়া হয়েছিল।

ফরিদার খালা বললেন দুই হাজার টাকা। এক হাজার উসুল, এক হাজার বাকি। তালাক দেয়ার সময় টাকা এক হাজার সঙ্গে দিয়ে বললো, কাবিনের টাকা এ পর্যন্ত কেউ আমার কাছে পাবে না। যাদেরকে তালাক দিয়েছি সবার টাকা শোধ করে দিয়েছি।

আব্বা এর প্রতিশোধ নেবেন বলে জানিয়ে বাইরে কোথায় বের হয়ে গেলেন।

রমজান চলছে। ঈদুল ফিতর সামনে তিনি আমাদের সবাইকে নিয়ে এক সন্ধ্যায় ইফতার করতে বসলেন। এবং ওই সময় ঘোষণা দিলেন, ফরিদার পুনরায় বিয়ে তিনি ঠিক করে ফেলেছেন। এই ঈদের পরদিন বিয়ে।

আব্বার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। এক চতুর ঘটকের মাধ্যমে তিনি ফরিদার পূর্ব স্বামীর সঙ্গেই বিয়ে ঠিক করলেন। ঘটককে তিনি সব খুলে বলেছিলেন এবং কিছু প্যাচবুদ্ধিও তার মাথায় চালান দিয়েছিলেন। ফলে ফরিদার স্বামী, বিশেষ কিছু না জেনেই বিয়েতে রাজি হয়। তার হয়তো ভাবনা ছিল, এতো কি জানার আছে, মাস খানেরই তো ব্যাপার! এরপর অন্য মেয়ের সন্ধান। কিন্তু তার পা যে এবার কোথায় আটকালো সে খবর যদি জানতো তাহলে দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাচতো।

দেখতে দেখতে ঈদ এলো। পরদিন বিয়ে। বিয়ে ধুমধামের সঙ্গেই হবে। এলাকাবাসী নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হলেন। বিশেষ ব্যক্তিদের উপস্থিতিও থাকবে।

যথাসময়ে বরপক্ষ এলো। সবাইকে খাওয়ানো হলো। যখন বিয়ে পড়ানোর পালাজামাই ব্যাটা তো কাবিন শুনে লাফ দিয়ে উঠে দাড়িয়ে পড়লো। বলে কি, কাবিন এক লাখ পাচ হাজার টাকা! মাত্র পাচ হাজার টাকা উসুল, বাকি এক লাখ।

আব্বা তখন কঠোর হলেন বললেন, বিয়ে যদি করতে চাও তাহলে বসে যাও। আর যদি জেলে যেতে চাও তাহলে বহু বিয়ের জন্য তোমায় সেখানেও পাঠাতে পারি। কোনটি তোমার পছন্দ তাড়াতাড়ি জানাও।

কর্তৃপক্ষ শক্ত হাতের মানুষ তা তার বুঝতে বাকি রইলো না। বিয়েই যথার্থ।

চমকের কি দেখলে! আসল চমক তো টের পাবে পরে। আসল চমক তো আমরা বুঝতেই পারছিলাম যখন আমাদের মাচাঘরে বাসর ব্যবস্থা করে তার আগের স্ত্রী ফরিদার সঙ্গে দেয়া হবে। আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল এ সময় যদি তাদের অবস্থাটা দেখতে পারতাম! কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। কারণ বাসর ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ ধর্ম বিরুদ্ধ।

আজ আব্বা নেই। কিন্তু তাদের বিয়ে এখনো টিকে আছে। নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণী তাদেরকে জীবনে খুব কম হিসাব মেলাতে হয়। এ জন্য তাদের ভাঙতেও সময় লাগে না, গড়তেও সময় লাগে না। যতো সমস্যায় পড়তে হয় মধ্যবিত্তের।

ময়মনসিংহ থেকে

নিখোজ সুকণ্ঠী

- হাফিজ রশীদ

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইউনিভার্সিটি। শহীদ জিয়াউর রহমান হল। রাত দুইটা।

জেনেটিক্স অ্যান্ড প্লান্ট বৃডিংয়ের সেকেন্ড পিরিওডিকাল পরীক্ষার আগের রাত।

বসে বসে জেনেটিক্স-এর সমস্যার সমাধান করছিলাম। কিছুতেই একটা সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। একজন সুন্দরী ফর্শা মেয়ে বিয়ে করলো কালো এক নিগ্রোকে। তাদের সন্তানের চোখের রঙ কি হবে এই জাতীয় সমস্যা। কোনোক্রমেই জিনের সেটিং মিলছে না।

সমস্যায় কনসেনট্রেশন দিতে পারছিলাম না। নিজ হাতে এক মাগ কড়া কফি বানালাম। কফিতে চমুক দেবো এমন সময় আমার মোবাইল ফোনে একটা রিং এলো। অচেনা নাম্বার অচেনা হলে সহজে ধরি না। কারণ কেউ যদি মিসকল দিতে চায় তাহলে দুই একটা রিং হলেই সে লাইন কেটে দেবে। না, বার বার রিং বাজছে। ফোন ধরলাম। ফোন ধরেই সাধারাণত সালাম দিই। তাই করলাম।

অপর প্রান্ত থেকে রিনিঝিনি সুরেলা নারী কণ্ঠ ভেসে এলো, আমি কার সঙ্গে কথা বলছি?

আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে। যেসব মেয়েদের টেলিফোনে কণ্ঠস্বর ভালো হয় তাদের চেহারা খারাপ হয়। টেলিফোন করেই সাধারণত কেউ এ ধরনের প্রশ্ন করে না। ভীষণ রাগ হলো। তারপরও শান্তভাবে বললাম, সেইম কোয়েশ্চন টু ইউ?

কোনো ভনিতা না করেই উত্তর এলো, আমি আইরিন। রাজশাহী মেডিকাল কলেজের পলিন হস্টেল থেকে বলছি। আপনি কি জীবন?

আমার কিছু কাছের লোক আমার এই নামটা জানে। অধিকাংশ লোককেই এই নামটা বলি না। তারপরও বললাম, হ্যা। আপনি কে?

নাম তো বললাম। আগামীকাল আমার মাইক্রোবায়োলজি পরীক্ষা। পড়াশোনা করতে করতে মাথা জ্যাম হয়ে গেছে। ভাবলাম আপনাকে একটু রিং করি।

রিং তো করলেন, নাম্বার পেলেন কোথায়?

সাম হাউ, ম্যানেজ করেছি। আমি যদি আপনার সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করতে চাই তাহলে আপনার কি সমস্যা আছে?

আমার মাথা থেকে জেনেটিক্স-এর সমস্যা, পিরিওডিকাল পরীক্ষা, কফির মাগ সব হারিয়ে গেছে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছি। গল্প, উপন্যাসে এ রকম কাহিনী অনেক শোনা যায়। এটা কি সে রকম গল্প? বললাম, নাহ, সমস্যা কি? কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না।

অচেনা থেকে এক সময় চেনা হয়ে যাবে। ফ্রম আননোন টু নোন, দেন ফেন্ডশিপ। কাল পরীক্ষার পর আবার কথা হবে। বিরক্ত হবেন না তো?

তারপর লাইনটা কেটে গেল। আমি থ মেরে বসে রইলাম। কে হতে পারে? অনেক চিন্তা করার পর সুকণ্ঠীকে চিনতে পারলাম না। তারপর নাম্বারটা সেভ করতে যাবো। নাহ, তা হলো না। কারণ আমার মোবাইল ফোনে রিসিভ কল স্টোর করা যায় না। A35 সেটের এই সমস্যা।

পরের দিন সারা রাত জেগে রইলাম। নাহ, কোনো ফোন এলো না। তার পরের দিনও না, পরের সপ্তাহেও না।

এমনকি পরের বছরও না।

এক সময় আইরিন মেয়েটাকে ভুলে গেলাম।

এর ঠিক সোয়া দুই বছর পর।

রাজশাহীর তানোর-এ একটা বেসরকারি সংস্থার সিড টেকনলজিস্ট হিসেবে চাকরি করি। সেদিন রাতে আমার খুব মাথা ব্যথা করছিল। একটা পেইন কিলার খেয়ে শুয়ে পড়ছিলাম। ঘুম আসছিল না। রাত একটা কিংবা দুইটার দিকে আমার মোবাইল ফোনে একটা রিং এলো। অচেনা নাম্বার।

অনেকগুলো রিং হবার পর ফোন ধরেই সালাম দিলাম। হ্যালো, জীবন বলছি। আপনি কে?

একটা মিষ্টি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। আমি আইরিন, আপনি কেমন আছেন?

রাগতস্বরে বললাম, আইরিন নামে আমি কাউকে চিনি না।

আমার একটা ফাজিল টাইপের কাজিন আছে ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজে পড়ে। মাঝে মধ্যে আমাকে পাজলড করে আনন্দ পায়। মনে করেছিলাম সে।

দেখ সুইটি, দুষ্টুমি করিস না। আমার খুব মাথা ব্যথা করছে।

অপরপ্রান্ত থেকে মিষ্টি কণ্ঠ ভেসে এলো, আমি আইরিন, রাজশাহী মেডিকাল কলেজের পলিন হস্টেল। একদিন আপনার সঙ্গে মিতালি করার জন্য টেলিফোন করেছিলাম।

আমার সোয়া দুই বছর আগের কথা মনে পড়লো। আমি শোয়া থেকে বসে পড়লাম। হ্যা, চিনতে পারছি। আপনি পরে আর টেলিফোন করেননি কেন?

করেছি। কিন্তু আপনি তো ইচ্ছে করেই ফোন ধরছিলেন না। সম্ভবত আমার নাম্বার দেখেই আপনি ফোন ধরেন না। পরে ভাবলাম বেহায়ার মতো আর ফোন করবো না। আজ ১৩ অক্টোবর আমার জন্মদিন। তাই ভাবলাম একবার রিং করিই না, আপনি এখন কোথায়?

কথাটা সত্যি না। আপনি আর একবারও টেলিফোন করেননি। আমি এখন রাজশাহীতে থাকি।

তাই? তাহলে তো বেশ। আসুন না আমাদের কলেজে। কালই আসুন।

একটু চিন্তা করলাম। কাল না, পরশু আসি। আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে?

পরশু সকাল সাড়ে নয়টার সময় আমার ক্লাস নেই। *ট্রমা সার্জিকাল* হোটেলে আমি পৌনে দশটার দিকে ব্রেকফাস্ট করবো। আমার সঙ্গে মোটা মতো একজন বান্ধবী থাকবে। আমার পরনে থাকবে শাদা কামিজ, নীল ট্রাউজার্স আর নীল ওড়না। আপনি ঠিক সাড়ে নয়টার পৌছে যাবেন। আমি দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো।

সাড়ে নয়টা কেন? আপনি তো আসবেন পৌনে দশটায়।

ছেলেরা সাধারণত আগে আসে।

আমাকে চিনবেন কিভাবে? প্রশ্ন করলাম।

ঠিকই আপনাকে চিনে নেবো। মেয়েদের সিক্সথ সেন্স ভালো থাকে, জানেন না? পরশু সকালে দেখা হবে। ভালো থাকবেন। বাই।

আমার মাথা ব্যথা হাওয়া হয়ে গেল।

পরের দিন একজন বন্ধু নিয়ে সোয়া নয়টার সময় হোটেলে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

না, আইরিন এলো না।

তারপর সমস্ত মেডিকাল কলেজ তন্ন তন্ন করে খুজলাম, আইরিন নামে কাউকে খুজে পেলাম না। যেহেতু আমার মোবাইলে রিসিভ কল থাকে না, তাই আইরিনকে আর টেলিফোন করা হয়নি। শুধু ১৩ অক্টোবর এলেই মনে হয় মেয়েটা আবার ফ্রেন্ডশিপ-এর প্রস্তাব দিয়ে টেলিফোন করবে।

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ থেকে

সমাধান

- রানা জামান

আবেদা লাইনে দাড়িয়ে। তাকে খুব হাসি-খুশি লাগছে। প্রতি মাসের এই দিনটিতে সে কষ্ট ভুলে হাসি-খুশি থাকে। পুরো মাসের পরিশ্রমের দাম সে হাতে পায়। এ মাসের বেতনটা তার জন্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ আবার দুশ্চিন্তারও। সামনে ঈদ। পরিবারের সবার জন্য নতুন জামা-কাপড় কিনতে হবে। মাসিক বাজেটের অতিরিক্ত খরচ। পরের মাসে ধার না পেলে আধপেটা থাকতে হবে। গার্মেন্টস কর্মীদের ঈদ বোনাস দেয়া হয় না।

আবেদা পায়ে পায়ে হিসাবরক্ষকের টেবিলে এলো।

হিসাবরক্ষক তিন হাজার টাকা থেকে একশ টাকা কেটে বাকি টাকা দিলে সে জিজ্ঞাসা করলো, একশ টাকা কম দিলেন ক্যান স্যার?

হিসাবরক্ষক পান চিবুতে চিবুতে বললো, দুই দিন লেইটে আসায় প্রশাসন পঞ্চাশ টাকা করে একশ টাকা কাটতে বলেছে।

স্যার, একদিন পোলাডার জ্বর হইছিল আর একদিন আমার জ্বর হইছিল। দশ মিনিট লেইটে আসছিলাম স্যার।

আমাকে ব্যাখ্যা শুনিয়ে লাভ নেই আবেদা। এই ফ্যাক্টরির প্রশাসন খুব কড়া। কারো কোনো ছুটি নেই। ছুটি নিলে উইদাউট পে হয়ে যায়। তুমি সরে দাড়িয়ে আমাকে কাজ করতে দাও।

আবেদা টাকাটা ভ্যানেটি ব্যাগে ঢুকিয়ে মরা মনে মেশিনের সামনে এসে বসলো।

পাশ থেকে রাজিয়া বললো, অফিস শেষে নিউ মার্কেটে যাবি রে আবেদা?

আবেদা শার্টের হাতা মেশিনে দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো, নিউ মার্কেটে ক্যান?

ঈদের মার্কেটিং করবি না?

নিউ মার্কেটে মার্কেটিং কইরা কি পারুম! আমাগো কি এতো টাকা আছে?

আরে বুঝ না! গাউসিয়া মার্কেটের বাইরে ফুটপাথে যা কিনতে চাইবি তাই পাবি। কতো সুন্দর সুন্দর জুতা! শোরুমে যেটার দাম আড়াইশ টাকা সেটা সেখানে সত্তর টাকায় কিনতে পারবি।

আর কেডা যাইবো?

তুই, শেফালি আর আমি।

ঠিক আছে।

অফিস শেষে তিনজন বাসে গাউসিয়া মার্কেটের মোড়ে নামলো। ফুটপাথে প্রচুর দোকান, প্রচণ্ড ভিড়।

রাজিয়া উচ্ছল কণ্ঠে বললো, চল, গাউসিয়ার ভেতর থাইকা ঘুইরা আসি!

আবেদা বললো, খালি খালি ভেতরে যাবি ক্যান? ভেতর থাইকা কাপড় কিনবি নাকি?

না কিনলাম, দাম জিগাইতে দোষ কি! ভেতরে কতো রকমের কাপড়! কতো কাপড়!

দাম যে জিজ্ঞাসা করবি, দোকানদার ফান্দে ফালাইবো না তো?

কি যে কস না! আমি বোকা নাকি! পাচশ টাকা দাম চাইলে পঞ্চাশ টাকা কমু। তোরা কেউ কিছু কইস না।

ঠিক আছে।

তিনজন গাউসিয়া মার্কেটের ভেতরে প্রবশ করলো। প্রচণ্ড ভিড়। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড গরম যেন ভাপ বের হচ্ছে। এক্সজস্ট ফ্যানগুলো না চললে মার্কেটের ভেতরটা ইটের ভাটা হয়ে থাকতো। চারদিক থেকে সেলসম্যানরা কাস্টমারদের ডাকছে।

তিনজন একটি দোকানে দাড়ালো।

সেলসম্যান জিজ্ঞাসা করলো, কি নেবেন আপু?

রাজিয়া একটা কাপড় দেখিয়ে বললো, এইডা থৃ পিস না?

সেলসম্যান দ্রুত থৃ পিসটা খুলে গায়ে মেলে ধরে বললো, খুব সুন্দর কাপড় আপু! আপনেরে খুব মানাইবো!

রাজিয়া গম্ভীর হতে চেষ্টা করে কাপড়ে হাত লাগিয়ে কিছুক্ষণ দেখে বললো, সিনথেটিক নাকি?

কি যে কন না আপু! একদম খাটি সুতি। পিনলে মনে হবে তুলা জড়াইয়া আছেন!

দাম কতো?

দেড় হাজার টাকা।

এতো দাম!

আপনি একটা দাম কন। একদম কম লাভে আপনেরে দিয়া দিমু।
আরো দুয়েকটা দোকান ঘুইরা লই। রাখেন।
অহনো বউনি হয় নাই আপু। একটা দাম কইয়া যান। কাস্টমার লক্ষ্মী।
কি কন আপনে! সারা দিনও বউনি করতে পারেন নাই?
দুপুরের পর আর বউনি হয় নাই! একটা দাম কন। আপনার যা মন চায়।
না না। আমি অহন দাম কমু না।
এইডা কেমন কথা আপু! আমার কাপড়ের কি এক পয়সাও দাম নেই? এক পয়সাই কন! তবুও দামটা শুনি।
আবেদা ফিস ফিস করে বললো, আমার সুবিধা মনে হইতাছে না। দাম করলেই গছায়া দিবো। চল যাইগা!
রাজিয়া ফিস ফিস করে বললো, আমি অতো বোকা না! দেখো কি দাম কই।
সে সেলসম্যানের দিকে তাকিয়ে বললো, দুইশ টাকা দিমু।
কি কন আপা! দেড় হাজার টাকার মাল দুইশ টাকা! আমি কিছু মনে করি নাই আপু। কাস্টমার লক্ষ্মী। আর কিছু বাড়াইলে কাপড়টা আপনেরে দিয়া দিতাম।
তারা কিছু না বলে হাটতে শুরু করতেই সেলসম্যান ফের বললো, রাগ করলেননি আপু? আর পচিশ টাকা দেন।
তারা দাড়ালো।
শেফালি ফিস ফিস করে বললো, কি করবি রাজিয়া? নিবি নাকি?
রাজিয়া বললো, শস্তাই তো! নিয়া নিই! সে ঘুরে সেলসম্যানকে বললো, আর বাড়াইতে পারুম না। দুইশ টাকায় দিলে দেন, নাইলে গেলাম!
সেলসম্যান বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললো, দুইশ টাকায় পারতাছি না আপু! আর পচিশটা টাকা দেন!
রাজিয়া ঘোরার উপক্রম করতেই সে দ্রুত বললে, ঠিক আছে। দুইশ টাকাই দেন। আপনে জিতলেন। আমার কোনো লাভ হইলো না।
জেতার আনন্দ নিয়ে রাজিয়া টাকা দিয়ে কাপড়ের প্যাকেটটা নিল। এই সময় বিদ্যুৎ চলে গেল। ভয়াবহ অন্ধকার। স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর নেই। কিছু দোকানে চার্জার জ্বলতে শুরু করেছে। এই সময়ে একটি কঠিন হাত শেফালির বুকে চাপ দিয়েই সরে গেল।
শেফালি চিৎকার দিতেই রাজিয়া জিজ্ঞাসা করলো, কি হইছে রে? চিল্লাইয়া উঠলি ক্যান?
কোন শয়তান আমার দুধে হাত দিছে!
কস কি?
আধার কেটে চোখে আলো সরে এসেছে।
আবেদা বললো, এইখানে বদমাইশ লোকজন আছে। বাইরে চল।
তারা বাইরে বের হয়ে এলো।
রাজিয়া বললো, বড় মাইয়াডার থৃ পিস কিনা হইয়া গেল। এখন অন্যগুলো কিনতে হইবো।
আবেদা বললো, চল আগে জুতা দেখি।
ওভারবৃজের নিচেই জুতার দোকান। অনেকগুলো।
আবেদা নিজের জন্য জুতা পছন্দ করলো।
দোকানদার দাম বললো, আড়াইশ টাকা।
রাজিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বললো, কি কন আপনে! এই জুতা পঞ্চাশ টাকার বেশি হইবো না। যদি পঞ্চাশ টাকায় দেন তো লই।

না, এতো শস্তা না! আর কিছু বাড়াইতে পারেন কি না দেখেন।

চল অন্য দোকানে যাই।

তারা একে একে সাতটি দোকান দেখে সত্তর টাকায় জুতার দাম ধার্য হলো।

আবেদা জুতার প্যাকেট হাতে দিয়ে ভ্যানেটি ব্যাগে হাত দিয়ে তীক্ষ্ম কণ্ঠে বললো, রাজিয়া, আমার তো টাকা নাই!

আতকে উঠে দুজন বললো, কি বলতাছস আবেদা! ভালো কইরা দেখ!

আবেদা ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর হাতড়াচ্ছে, সেই সঙ্গে ও ঘামছে।

রাজিয়া ও শেফালি উদ্বিগ্ন হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ব্যাগের কাটা অংশ দিয়ে আঙুল বের হতেই আবেদ আর্তনাদ করে উঠলো। আমার ব্যাগ কাইটা সব টাকা নিয়ে গেছে রে!

আবেদা জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়লো।

দুজন তৎক্ষণাৎ নিজেদের ভ্যানিটি ব্যাগ দেখলো। টাকা আছে এবং কাটেওনি।

মুহূর্তে তাদেরকে ঘিরে লোকজন জড়ো হলো।

একজন বললো, এই মেয়েটা ফিট হয়ে গেছে! কি হয়েছে তার?

রাজিয়া জ্ঞানহীন আবেদার কাছে বসে বিষণ্ন কণ্ঠে বললো, পকেটমার তার ব্যাগ কাইট্টা সব টাকা লইয়া গেছে।

আহা রে!

পকেটমাইর গরিব মাইয়া মাইনসের ব্যাগ কাটতে গেল! বড়লোকের পকেট কাটলে টাকাও বেশি পাইতো, এই মাইয়াটাও কষ্ট পাইতো না।

ফুটপাথে বড়লোকেরা মার্কেটিং করতে আসে না। তারা মার্কেটিং করে সুপারমার্কেটে। পকেটমারা তাদের পকেট মারতে পারে না।

একজন বললো, বইন, আপনে ওনাকে বাসায় লইয়া যান। ওনার জ্ঞান ফিরাইতে হইবে। এখানে থাকলে মানুষজন তামাশা দেখবো। আপনাগো কোনো উপকার হবে না।

দুজন অজ্ঞান আবেদাকে মিরপুর দুই নাম্বার বস্তিতে নিয়ে এলো।

বস্তির সবাই তাদের ঘিরে ধরলো।

ঘটনা শুনে সবাই আফসোস করতে লাগলো।

আবেদার দুটো মেয়ে তার গায়ে পড়ে কাদছে।

মেয়েটি দুটোকে সরিয়ে নাকে মুখে পানি ছিটিয়ে আবেদার জ্ঞান ফেরানো হলো।

সন্তান দুটোকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেদা চিৎকার করে কাদতে কাদতে বললো, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে রে মায়েরা। আমাদের ঈদ হইবো না, খাওয়া হইবো না।

মায়ের সঙ্গে মেয়ে দুটোও কাদতে লাগলো।

মা–মেয়ের কান্নায় উপস্থিত মহিলাদের চোখেও অশ্রু চলে এলো।

আবেদার মাথায় হাত বুলিয়ে মহেলা বিবি বললো, কান্দিস না রে মা। অহন কাইন্দা আর কি হইবো। তোর সঙ্গে মাইয়া দুইডাও কানতাছে। মনডারে শক্ত কর। আল্লাহ পেট দিছে, আল্লাহ খাওয়ানের জোগাড় কইরা দিবো।

সুলালী বললো, কসাইডারে খবর দেওন যায় না? বেজন্মাডা দুইডা বাচ্চা পয়দা কইরা দুই নাম্বার বৌ নিয়া আগারগাও বস্তিতে আরামেই আছে!

আবেদা কান্না থামিয়ে রেগে বললো, ওই বেডারে খবর দিবা না! আমি তার মুখ দেখতে চাই না।
আবেদা পরদিন ফ্যাক্টরিতে এসে ম্যানেজারের রুমে ঢুকেই কেদে ফেললো।
ম্যানেজার মোবাইলে কথা বলছিলেন। তিনি স্পিকারে হাত চেপে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? তুমি কাদছো কেন?
আবেদা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, গত কাইল আমার সর্বনাশ হইয়া গেছে স্যার।
ম্যানেজার হাত তুলে তাকে থামিয়ে মোবাইলে বললেন, এক লেবার চেম্বারে ঢুকে কাদছে। তাকে বিদায় করে তোমাকে আবার রিং করবো। কেমন? মোবাইল অফ করে আবেদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে তোমার, বলো।
গত কাইল গাউসিয়া মার্কেট থাইকা আমার ভ্যানিটি ব্যাগ কাইট্টা পকেটমাইর বেতনের সব টাকা নিয়া গেছে স্যার।
কি সর্বনাশ! তাহলে তো তোমার মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল। তোমাকে আরো সাবধানে থাকা উচিত ছিল।
ঘরেও আমার কোনো টাকা পয়সা নেই স্যার। স্বামীডা দুই নাম্বার বৌ নিয়ে আলাদা থাকে। সামনের মাসটা কেমনে চলুম স্যার?
কঠিন পরিস্থিতি! কিন্তু আমি কি করতে পারি বলো।
যদি এক মাসের বেতন অগ্রিম দিতেন স্যার।
তোমরা জানো, প্রাইভেট কম্পানিতে অগ্রিম দেয়া হয় না। তোমাদের চাকরিরই নিশ্চয়তা নেই। সরি আবেদা! সময় নষ্ট না করে কাজে যাও।
আমি চোখে অন্ধকার দেখছি স্যার। একটু দয়া করেন।
আমি নিয়ম ভেঙে কিছু করতে পারবো না আবেদা। তবে তুমি রাজি হলে পথ দেখাতে পারি।
কি পথ স্যার?
এর আগে একদিন এমডি তোমাকে চেম্বারে ডেকেছিলেন। তুমি রাজি হওনি, ঠিক?
জি। আমি এসব পছন্দ করি না।
তবুও তোমার ভয়াবহ অসুবিধা দেখে বলছি, স্যার মাঝে মধ্যে তোমার কথা বলে আফসোস করেন। তুমি রাজি হলে স্যারকে বলতে পারি।
না স্যার! মাইয়া দুইডারে মাইরা ফাস লইয়া মইরা যামু তবুও ওই কামে যামু না।
তাহলে আমার কিছু করার নেই! তুমি এখন যেতে পারো।
ম্যানেজারের চেম্বারে থেকে আবেদা বের হতেই সবাই তাকে ঘিরে ঘটনা জানতে চাইলো।
তার কথা শুনে হামিদা সবাইকে বললো, আমরা ইচ্ছা করলেই আবেদার বাচাইতে পারি।
রাজিয়া বললো, কেমনে?
আমরা এই ফ্যাক্টরিতে পাচশ গার্মেন্টস কর্মী আছি। আমরা সবাই পঞ্চাশ টাকা কইরা দিলে আবেদার সংসারটা বাইচা যায়। নাইলে আবেদার সংসার বাচানোর জন্য এমডির লালসার শিকার হতে হইবো। পঞ্চাশ টাকা কইরা দিলে আমাগো তেমন ক্ষতি হইবো না।
সবাই নীরব।
কিছুক্ষণ পর রাজিয়া বললো, হামিদাআপার প্রস্তাবটা খুব সুন্দর! আমি রাজি।
ক্রমেই সবাই রাজি হলো।
হামিদা সবার কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে আবেদাকে দিল।
আবেদা টাকাটা হাতে নিয়ে হামিদাকে জড়িয়ে ডুকরে কেদে উঠলো।

হামিদা আবেদাকে জড়িয়ে রেখে সবাইকে বললো, এখন থাইকা আমরা এভাবে আমাগো বিপদে-আপদে সাহায্য করুম।

হামিদার এ কথায় সবাই খুব খুশি হলো।

ম্যানেজার সবাইকে কাজ ফেলে জড়ো হতে দেখে চেম্বার থেকে বের হয়েছিলেন। তিনি তাদের নজির বিহীন সহযোগিতা দেখে মনে মনে বললেন, গার্মেন্টস কর্মীরা কতো চমৎকারভাবে আবেদার সমস্যার সমাধান করে দিল। এটা না হলে মেয়েটাকে নষ্ট হতে হতো অথবা আত্মহত্যা করতে হতো। কিন্তু এমডি এটা জানতে পারলে কারো চাকরি থাকবে না।

জানাবো কি, নাকি জানাবো না? ম্যানেজার এই প্রশ্নের উত্তর খোজায় ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

জয়পুরহাট থেকে

দৈনন্দিন কুসংস্কার

- সাজ্জাদ হোসেন মজুমদার প্রবাল

খণ্ডচিত্র- ১.

সম্প্রতি বিয়ে করেছি। আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রায়ই এটা-ওটা পাঠায়। কোনো খাবারের জিনিস পাঠালে তার সঙ্গে আবশ্যিকভাবে কয়েকটি রসুন ও শুকনো মরিচ দিয়ে দেয়।

স্ত্রীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বললো যে, খাবারের জিনিসের সঙ্গে এগুলো দেয়া মঙ্গলজনক। এটা নাকি নিয়ম! তা না হলে খাবারে নাকি কোনো বদআছর হতে পারে।

খণ্ডচিত্র- ২.

আমার মেজমামা রাতের বেলা, বিশেষ করে বৃহস্পতিবার রাতে কোনোক্রমেই খাবারের এটো পানি (আইডা পানি) ঘরের বাইরে ফেলতে দেন না। কারণ তখন নাকি পূর্ব-পুরুষদের আত্মা ঘরের আশপাশে ঘুরে বেড়ায়।

উপরের ঘটনা দুটো ভিন্ন হলেও এর মূল সুর এক ও অভিন্ন। তা হলো, সমাজ জীবনে নিয়ম-নীতির নামে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার যা আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। বর্তমান বিজ্ঞানের হাইটেক যুগেও অধিকাংশ মানুষ এগুলো বিশ্বাস করে ও মেনে চলে। কেবল গ্রামে-গঞ্জে নয়, শহরেও এগুলো মানার প্রচলন রয়েছে। এসব লোকাচার তথা কুসংস্কারগুলোর উৎপত্তির ভিত্তি মূলত ভয়, ধর্ম নয়।

প্রাচীনকালে অজানা অমঙ্গল আশংকায় আতংকিত মানুষ হয়তো না জেনে, না বখে কিছু লৌকিক নিয়ম মেনে চলতো যার প্রভাব এখনো রয়েছে। পূর্ব পুরুষদের জের ধরে কুসংস্কারগুলো আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে রেখেছে। এ ব্যাপারে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই প্রায় এক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার নিচে তুলে ধরছি :

০১. কারো বার বার সন্তান জন্মগ্রহণ করে মারা গেলে এরপরের কোনো সন্তান যদি বেচে যায় তখন তার বিচিত্র ধরনের নাম রাখা হয়। যেমন ছেলে হলে *টেমা, পচা, ডিব্বা, ঘটি, বাটি, ঝাড়ু* ইত্যাদি। আর মেয়ে হলে *বাতাসি, ফালানি, জিলাপি*। কারণ এ রকম নাম শুনে যম যেন বুঝতে না পারে এরা মানব সন্তান। এসব আজে-বাজে, শ্রুতিকটু নাম রেখে যমকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হয় যাতে এবারের সন্তানটার দিকে তার নজর না পড়ে। আবার একই পরিস্থিতিতে কোনো ছেলে শিশু বেচে গেলে তাকে *মল্লি ছেলে* বলা হয়। এদের এক কান ফুটো করে তাতে ছোট একটা লোহার রিং পরানো হয়। কারণ ছেলে শিশুকে মেয়ে বানিয়ে যমকে নাকি গোলকধাধায় ফেলে ফাকি দেয়া হয় যাতে ছেলেটি বেচে যায়।

০২. ছোট শিশুকে কোলে নিয়ে কোথাও বের হবার আগে শিশুর বাবা–মা অথবা অভিভাবক শ্রেণীর কেউ শিশুর কপালের একপাশে কাজলের ফোটা দিয়ে দেয় যাতে কারো নজর না লাগে। এতে নাকি শিশুটি সমস্ত অমঙ্গল থেকে রক্ষা পায়।

০৩. শিশুদের দুধের দাত পড়ে যখন নতুন দাত উঠে তখন নতুন ওঠা দাত যেন সুন্দর হয় সে জন্য পড়ে যাওয়া দাত ইদুরের গর্তে ফেলে *ইদুর ভাই, তুমি আমার বিশ্রী দাতটি নিয়ে তোমার সুন্দর দাতটি আমার দিও*। এ রকম বললে নাকি শিশুর নতুন ওঠা দাত সুন্দর ও মজবুত হয়।

০৪. কোনো শিশুর পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে হাটা নাকি অসুখ–বিসুখ ডেকে আনার লক্ষণ।

০৫. শিশুরা ভয় পেলে দা–এর ওপর এক চিমটি লবণ রেখে খাওয়ানো হয়। এতে নাকি শিশুদের ভয় চলে যায়।

০৬. যাত্রাকালে কোনো শিশুকে অন্ততপক্ষে এক সঙ্গে দুই লোকমা খাবার খাইয়ে দিতে না পারলে নাকি ওই শিশুর পানিতে পড়ে মারা যাবার ভয় থাকে।

০৭. ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে যাবার সময় ডিম, কলা ইত্যাদি খেতে গুরুজনরা নিষেধ করেন। কারণ এতে নাকি পরীক্ষায় ফলাফল খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে।

০৮. যাত্রাকালে *কালো বিড়াল, ঝাড়ু, খালি কলস* ইত্যাদি দেখলে কিংবা নিঃসন্তান লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে নাকি যাত্রা নাস্তি হয়। এছাড়া যাত্রাকালে পেছন থেকে *ডাকা, হাচি* দেয়া ইত্যাদিও অমঙ্গলকর বলে মনে করা হয়। আবার যাত্রা শুরুর সময়ে কেউ যদি হোচট খায় বা কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগে তখন একটু অপেক্ষা করে তারপর যাত্রা শুরু করতে হয়। তাহলে নাকি আর অমঙ্গল হবার আশংকা থাকে না।

০৯. বাপ কাঠামো মেয়ে ভাগ্যবতী আর মা কাঠামো ছেলে নাকি ভাগ্যবান হয়।

১০. ভাত রেধে স্বামী বা গৃহকর্তার আগে খেলে নাকি গৃহবধূর অমঙ্গল হয়।

১১. গৃহস্থ বধূর ঘরের মধ্যে বড় করে শ্বাস ফেলা নাকি কল্যাণকর নয়।

১২. স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করলে নাকি স্বামীর আয়ু কমে যায়।

১৩. খাওয়ার সময়ে বিষম লাগলে (নাকে–মুখে খাবার উঠলে) প্রিয়জন স্মরণ করছে বলে বিশ্বাস করা হয়। আবার একই পরিস্থিতিতে জিভে বা ঠোটে কামড় পড়লে কেউ নিন্দা করছে বলে মনে করা হয়।

১৪. শনিবার দিন হিসেবে নাকি ভালো নয়। কারণ ওই দিন শনির ছায়া পড়ে আমাদের কর্মে।

১৫. রাতের বেলা কোনো অবস্থাতেই গাছের ফল পাড়া মঙ্গলজনক নয়। যদি একান্তই ফল পাড়ার দরকার হয় তখন নাকি গাছের সামনে দাড়িয়ে *জাগো জাগো* বলে গাছকে জাগিয়ে তারপর গাছের অনুমতি নিয়ে ফল পাড়তে হয়।

১৬. রাতের বেলা এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে আগুন নিয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক নয়। যদি নিতেই হয় তবে তা মাটিতে স্পর্শ করতে হয়। না হলে নাকি বিপদের ভয় থেকে যায়।

১৭. রাতে করুণ বিলাপের মতো দীর্ঘ একটানা কুকুরের ডাক অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন বলে মনে করা হয়। আবার একইভাবে পেচার ডাকও অমঙ্গলকর।

১৮. রাতের বেলা যমকুলি (দিনে কানা) পাখির ডাকও বিপদের লক্ষণ বলে মনে করা হয়।

১৯. ভর সন্ধ্যায় বা ভর রাতে ভিক্ষা দেয়া নাকি অমঙ্গল। এতে নাকি ঘরে অলক্ষ্মী আসে।

২০. রাতে ঘর ঝাড়া দিয়ে ময়লা আবর্জনা বাইরে ফেলাও নাকি অকল্যাণকর।

২১. ভর সন্ধ্যা বা ভর দুপুরে মেয়েদের চুল আলুথালু করে পুকুর পাড়, তেতুল গাছ, তুলা গাছ, বাশঝাড় ইত্যাদির কাছ দিয়ে যাওয়া অমঙ্গলকর। এতে নাকি জিন–ভূতের আছর করার সম্ভাবনা থাকে। কারণ তখন নাকি জিন–ভূতের ওই সকল স্থান দিয়ে চলাফেলার সময়।

২২. ভর সন্ধ্যায় কিছু খাওয়া নাকি অমঙ্গলকর। কারণ এ সময় নাকি যমদূতের খাবার সময়।

২৩. কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে কুমারী মেয়েরা কনের পাটিতে বসলে এবং কনের গায়ে লাগানো হলুদ কুমারী মেয়েদের গায়ে লাগিয়ে দিলে নাকি অবিবাহিতা (কুমারী) মেয়ের তাড়াতাড়ি বিয়ে হবার সম্ভাবনা থাকে। আবার অবিবাহিতা মেয়ের গায়ে প্রজাপতি বসলেও নাকি বিয়ে তাড়াতাড়ি হয়।

২৪. অবিবাহিতা মেয়েরা ঘরের মধ্যে পায়চারী করে মাথা আচড়ালে নাকি তাদের বিয়ের সময় নানান বদনাম রটে।

২৫. চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময়ে কিছু খেতে নেই। এতে নাকি পেটের অসুখ হয়। গর্ভবতী মহিলারা এ সময়ে কিছু খেলে তাদের সন্তান নাকি বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে।

২৬. ব্যাঙ মারা নাকি ভালো না। কারণ নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে যখন হযরত ইব্রাহিম (আ.)–কে নিক্ষেপ করা হয় তখন ব্যাঙ নাকি ফু দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছিল!

২৭. টিকটিকি মেরে ফেলা নাাকি ভালো। কারণ রাসূল (সা.)–এর হিজরতকালে এক গুহায় যখন রাসূল (সা.) আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন শত্রুরা এসে গুহার মুখে মাকড়সার বাসা দেখে ওই গুহায় কেউ নেই মনে করে যখন চলে যাচ্ছিল তখন টিকটিকি ডেকে ওঠে। টিকটিকি নাকি শত্রুদেরকে রাসূল (সা.)–এর অবস্থান জানাতে চেষ্টা করেছিল।

২৮. ঘরে জুতা, স্যানডাল ইত্যাদি উল্টে থাকলে নাকি লক্ষ্মী চলে যায়।

২৯. গাছের ডালে চাতক (ফটিকজল) পাখি বসে থাকলে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নাকি থাকে। আবার হলদে পাখি (কুটুম পাখি) দেখলে বাড়িতে অতিথি আসার নাকি সংকেত বহন করে।

৩০. তরিতরকারি কাটার সময়ে এর ওপর দিয়ে হেটে যাওয়া ভালো নয়। এগুলো খেলে নাকি পেটের অসুখ হয়।

৩১. যে পাত্রে দই পাতা হয় সেটা পুকুরে ধোয়া অমঙ্গল। এতে নাকি গাভীর দুধ দেয়ার ক্ষমতা কমে যায়। আবার গাভীর দুধ মাটিতে পড়ে গেলে এবং তা মাড়িয়ে গেলেও নাকি গাভীর দুধ দেয়ার ক্ষমতা কমে যায়।

৩২. গৃহস্থের বাড়ির গরুর চোখ দিয়ে পানি ঝরলে বাড়ির কেউ মারা যাবার নাকি সম্ভাবনা থাকে।

৩৩. ঘরে স্বর্ণ হারানো অমঙ্গল। এটা নাকি ধন–সম্পদ নষ্ট হবার চিহ্ন।

৩৪. গৃহিণীদের চুল আচড়ানোর সময় যদি তাদের হাত থেকে চিরুনি পড়ে যায় অথবা রান্না–বান্নার সময়ে পাতিলের সরা (ঢাকনি) পড়ে যায় তাহলে নাকি বাড়িতে অতিথি আসার সম্ভাবনা থাকে।

৩৫. ঢোড়া সাপকে অর্ধমৃত অবস্থায় গোবরে পুতে রাখলে নাকি ঢোড়া সাপ বেচে যায়।

৩৬. কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে বাটি চালান, লাঠি চালান ইত্যাদি দেয়া হয়। এতে নাকি হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া জিনিস পাওয়া যায়।

৩৭. এক শিংওয়ালা গরু নাকি অনেক রোগ সারাতে কাজে লাগে।

৩৮. বড়শিতে কোনো মাছ না ধরলে এতে কারো মুখ লেগেছে বলে মনে করা হয় এবং তা বিশুদ্ধ করার জন্য বড়শিটিকে আগুনে পুড়িয়ে নেয়া হয়।

৩৯. গলায় মাছের কাটা ফুটলে বিড়ালের পা ধরলে তা নাকি চলে যায়।

৪০. বিড়াল মারা নাকি ভালো নয়। যদি কেউ বিড়াল মারে তাহলে বিড়ালের দেহের সমপরিমাণ ওজনের লবণ কাফফারা দিতে হয়। না হলে নাকি পাপ হয়।

৪১. জালালি কবুতর খাওয়া ভালো নয়। কারো বাড়িতে জালালি কবুতর বাসা তৈরি করলে শুভ লক্ষণ বলে মনে করা হয়।

৪২. বাড়িতে হাসনাহেনার গাছ থাকলে নাকি সাপ আসে।

৪৩. ঘরে ভাঙা কাপ, ভাঙা থালা, ভাঙা আয়না ইত্যাদি ব্যবহার করা নাকি অমঙ্গলকর।

৪৪. পুরুষের ব্যবহৃত গামছা, গেঞ্জি ইত্যাদি সেলাই করে ব্যবহার করা অমঙ্গলজনক।

৪৫. জোড়া শালিক দেখা ভালো। কিন্তু বেজোড় শালিক দেখলে নাকি অমঙ্গল হবার সম্ভাবনা থাকে। ইংরেজিতেও এ রকম একটি কথা আছে, One for sorrow, two for joy.

৪৬. কোনো পুরুষের বাম চোখ আর মেয়েদের ডান চোখ লাফানো অমঙ্গল মনে করা হয়।

৪৭. গৃহস্থ ঘরের ধান, চাউল বা এ জাতীয় কোনো কিছু বিক্রি বা হস্তান্তর করার সময় এর থেকে এক মুঠো রেখে দেয়া নাকি মঙ্গল।

৪৮. ভাত খাওয়ার সময় থালা নাড়াচাড়া করা, গালে বা মাথায় হাত রেখে খাওয়া অমঙ্গলজনক।

৪৯. পরনে কাপড় রেখে সেলাই করা অমঙ্গল। কারণ এতে নাকি সংসারে দারিদ্র নেমে আসে।

৫০. রাতের বেলায় সুচ বিক্রি করা নাকি অমঙ্গলজনক, এতে নাকি ব্যবসার লক্ষ্মী চলে যায়।

৫১. মায়ের স্তনের দুধ মায়ের মুখে কখনো ঢুকে গেলে অথবা আগুনে পড়লে নাকি সন্তান হঠাৎ মারা যাবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

৫২. কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে বাল্য বিধবা, তালাক প্রাপ্তা ও বন্ধ্যা মেয়েদের উপস্থিতি অমঙ্গলজনক বলে মনে করা হয়।

৫৩. কাকের ডাকেও নাকি শুভাশুভ থাকে। ক্ক ক্ক কল্যাণ লাভ, কঃ কঃ রাজোপদ্রব, করকং করকং প্রিয়জনের সাক্ষাৎ লাভ, কেতং কেতং সম্পদহানি ইত্যাদি। (দ্রষ্টব্য বাংলা সাহিত্যের কথা – ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)।

৫৪. শিশুরা বমি করলে বাদুড়ে খাওয়া কোনো পেয়ারা খাইয়ে দিলে নাকি বমির প্রবণতা কমে যায়।

৫৫. ভাত–তরকারির ডেগ চেচে–পুছে খেয়ে ফেললেও নাকি লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে পালায়। সংসারে অমঙ্গলের ছায়া পড়ে। অভাব অনটন বাড়ে।

লৌকিক নিয়ম–কানুনের নামে প্রচলিত এসব কুসংস্কারের অন্ত নেই। দেশের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে। কোনো অনুসন্ধিৎসু পাঠক হয়তো ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে আরো তথ্যাদি জানাবেন এই প্রত্যাশা করছি। যথাযথ জ্ঞানের আলোর দ্বারা এই কুসংস্কারের অন্ধকারকে দূরীভূত করা যেতে পারে।

কুমিল্লা থেকে

প্রয়োজনীয় জ্ঞান

- সাইফ সজল

স্যার, জানেন, রাতে আম্মুদের খাট নড়ার শব্দ পেয়েছি। স্যার, কেন নড়লো অতো রাতে খাটটি?

ক্লাস ওয়ান পড়ুয়া আমার ছাত্র ফাহিম যখন বিস্ময় ভরে এ রকম একটি প্রশ্ন করলো তখন বেশ অবাক হয়েছি। শুধু অবাকই হইনি, রীতিমতো নিজেকে প্রশ্ন করলাম, এতোটুকু বয়সে তাদের মাথায় এ রকম বিষয়বস্তু কে ঢোকালো?

এদিকে আমার ছাত্রী ছুম্মিও আমাকে প্রশ্ন করলো, স্যার, বলেন না কেন? বলেন স্যার।

সময়টা শেষ। মানে তাদের পড়ানোর সময় শেষ। মনে মনে বললাম, যাক বাবা, বড় বাচা বেচে গেছি!

উঠতে যাবো এমন সময় ফাহিম আর ছুম্মি একযোগে বলে উঠলো, স্যার, কালকে আপনি অবশ্যই বলবেন।

কোনো কথা না বলে দরজা খুলে বাসায় চলে এলাম।

ফাহিম-ছুম্মি চাচাতো ভাই-বোন এবং বড়লোক বাড়ির ছেলেমেয়ে। গত কয়েক মাস ধরে তাদের পড়াচ্ছি। তারা খুব দুষ্টু এবং চঞ্চল।

পরের দিন সন্ধ্যায় গেলাম পড়াতে।

তারা বই-খাতা, পেনসিল নিয়ে বসলো।

সোফায় বসে এক গাদা কাজ দিলাম দুজনকে।

দশ পনেরো মিনিট তারা কাজ করে বললো, স্যার, আজকে না আপনার বলার কথা?

বললাম, কি বলার কথা?

ছুম্মি বললো, ওই সব বিষয়ে বলবেন না স্যার?

আমি একটু প্রস্তুত হতেই ছুম্মি হাতের দুই আঙুলে মেয়েদের যৌনাঙ্গর মতো করলো। বললো, স্যার, এইটা বলে মেয়েদের ধন?

বললাম, কে বলেছে?

ফাহিম বললো, স্যার, লিথি আণ্টি বলেছে।

একটু দম নিয়ে বললাম, না।

তারা তো বিস্ময়ে থ। তারা আবার প্রশ্ন করলো, তাহলে কি স্যার?

এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম তাদেরকে সব কিছু জানানোর।

একটু কেশে তাদেরকে বললাম, ওটা হলো মেয়েদের যৌনাঙ্গ। তোমরা যখন বড় হবে তখন ওটা তোমাদের কাজে আসবে।

বিশেষ ভাবে গল্পের মাধ্যমে তাদেরকে বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিলাম। অতঃপর বললাম, তোমাদের বাবা-মারা এই কাজ না করলে তোমরা কি জন্মগ্রহণ করতে পারতে? তোমরা কি আমার কাছে পড়তে পারতে?

আমি দম ছাড়তেই ফাহিম মাথা ঝাকিয়ে বললো, ঠিকই তো স্যার।

ছুম্মি বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললো, তাহলে আমি বিয়েই করবো না স্যার। ওরে বাবা, জামাইয়ের সঙ্গে থাকতে পারবো না। খালি খাট নড়বে।

ফাহিম বললো, আমিও বিয়ে করবো না।

ছুম্মি বললো, স্যার, আপনি বিয়ে করবেন না?

আমিও বললাম, না।

তখন আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম।

অতঃপর এর সুফল আর কুফলের কথাও বললাম। এই বিষয়গুলো তাদের কাছে জানিয়ে ভারমুক্ত হলাম।

যে ফাহিম-ছুম্মি ছুটি দেয়ার আগেই ঘরে যাবার জন্য বই-খাতা ব্যাগে ঢুকিয়ে দৌড় দিতো, আজ তারাই ছুটি দেয়ার পর বই-খাতা গুছিয়ে আস্তে আস্তে ঘরে চলে গেল।

বুঝলাম, আজ থেকে তারা অনেক বড় হয়ে গেল, অনেক বড়।

টেপাখোলা বাজার মোড়, ফরিদপুর থেকে

ভেংকটেশ্বরের মন্দিরে

- আশফাকুল জলিল

অন্ধ্রপ্রদেশের বিখ্যাত দুই টুইন সিটি *বিশাখাপত্তনম* আর *ওবেয়র*। ওবেয়র রেল স্টেশনের কাছেই শহর থেকে কিছুটা দূরে ভেংকটেশ্বরের মন্দির। শুনেছিলাম এই মন্দিরের দেবতা অত্যন্ত জাগ্রত। অসংখ্য নিঃসন্তান রমণীকে সন্তান দান করেছে।

এই মন্দিরের পুরোহিতদের সম্বন্ধে নানান কথা শোনা যায়।

প্রকৃত রহস্য জানতে কয়েকদিন মন্দিরের কাছের হোটেলে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় মন্দিরের আশপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু পুরোহিত ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষের ভেতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে মন্দির অভ্যন্তর ভাগ দেখতে পারলাম না।

দুপুরবেলাটা হোটেল রুমে বসে ল্যাপটপে রোজনামচা লিখছিলাম। গরম থেকে বাচতে ঘরের দরজা খুলে রেখেছিলাম। লক্ষ্য করলাম তারই ফাক দিয়ে হোটেলেরই এক বয় উকি মারছে। হোটেলে অবস্থানকারী বোর্ডারদের কল না পেলে তাদের বিরক্ত না করার ট্রেনিং সত্ত্বেও এই বয়টি গতকাল দুপুরেও আমার রুমে উকি দিচ্ছিল।

ল্যাপটপটা এক পাশে সরিয়ে রেখে হাতের ইশারায় তাকে রুমের মধ্যে আসতে বললাম। তাকে বললাম, তুমি কি কিছু বলতে চাও?

চব্বিশ পচিশ বছর বয়সী ছেলেটি বললো, স্যার, আমার নাম রোহিত পান্ডে, টাকার অভাবে এইচএসসির পর আর লেখাপড়া করতে পারিনি। এই হোটেলে সামান্য বেতনে রুমবয়ের চাকরি নিয়েছি। এ কাজে উন্নতি হয় না। সারা জীবন রুমবয় হিসেবেই থাকতে হবে। কিন্তু কমপিউটারে টাইপ করা আর হিসাব রাখা শিখতে পারলে এখানেই অফিস অ্যাসিস্টান্টের চাকরি পাবো। তাতে বেতন বাড়বে এবং অভিজ্ঞতা হলে প্রমোশনও মিলবে। আপনি তো এই হোটেলে আরো কয়েকদিন থাকবেন বলে বুকিং দিয়ে রেখেছেন। সেই কয়েকদিনে যদি আমাকে কমপিউটারে কাজ করা শেখাতেন তাহলে এই গরিবের অশেষ উপকার হতো। আসলে স্যার, কমপিউটারের কোনো জ্ঞান নেই বলে আমাকে এখানকার কোনো মেশিনে বসার অনুমতি দেয় না যদি সব কাজ নষ্ট করে ফেলি! তবে মেশিন চালানোর সাধারণ জ্ঞানটুকু আয়ত্ব করতে পারলে ম্যানেজারকে বলে-কয়ে অফিসের কাজে ঢুকতে পারবো।

ছেলেটির আত্ম-উন্নয়নের আগ্রহে ভালো লাগলো। তাকে বললাম, যদি সময় পাই তাহলে দেখা যাবে।

বিকেল হয়ে গেছে। রুম বন্ধ করে ভেংকটেশ্বরের মন্দিরের দিকে রওনা হলাম। আজ মঙ্গলবার মন্দির অধিশ্বরের উপবাস ছিল। উপবাস শেষে বিশেষ পূজোর আয়োজন আছে। সন্ধ্যার মুখে ধূপ-ধুনো জ্বেলে ঢোল-করতাল বাজিয়ে আরতি হলো। আরতি শেষে প্রসাদ বিতরণ। মন্দিরের সিড়ির শেষ ধাপে বসে নৈমিত্তিক পূজো দিতে আসা পুরোহিত এবং পল্লিবালাদের আসা-যাওয়া দেখছিলাম।

কিছুক্ষণ পর ঢাকের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। মন্দিরের সব প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে পুরোহিতরা চলে যাচ্ছে। আবছা অন্ধকারের ভেতর থেকে এক পুরোহিত বললো, স্যার, আপনি এখানে!

ভালো করে খেয়াল করে দেখি পুরোহিতদের পোশাকে রোহিত পান্ডে।

সে এসে পাথরের সিড়িতে আমার পাশে বসে।

তাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি বুঝি এই মন্দিরের পুরোহিত।

রোহিত বলে, বংশানুক্রমে আমাদের পরিবার আরো গোটা বিশেক পরিবারের সঙ্গে এই মন্দিরের পুজো-আর্চা আর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

রোহিতকে বলি, তোমাকে কাজ চালানোর মতো কমপিউটার শিখিয়ে দেবো। কাল সকাল দশটার দিকে আমার কাছে এসো।

ছেলেটি বুদ্ধিমান। চার পাচ দিনেই এমএস ওয়ার্ডে চিঠিপত্র টাইপ করা, এক্সেলে মামুলি হিসাব রাখা, রেস্টুরেন্টের দৈনিককার মেনু তৈরি করা ইত্যাদি শিখে ফেললো।

আশপাশটা ঘুরে দেখা শেষ হওয়াতে আগামীকাল ভোরে চেন্নাই-এর দিকে রওনা হওয়ার পরিকল্পনা করলাম। রোহিতকে বললাম, কাল ভোরেই চলে যাবো। তবে ভেংকটেশ্বরের মন্দিরের ভেতরটা দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। তা আর হলো না!

রোহিত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, আপনি আমার অশেষ উপকার করেছেন। হোটেলের ম্যানেজার বলেছেন, আগামী মাস থেকেই আমাকে অফিস সহকারীর পদে কাজে লাগিয়ে দেবেন। যাই হোক স্যার, আজ সন্ধ্যার পূজো শেষ হওয়ার পরেই আপনাকে মন্দিরের ভেতরটা ঘুরিয়ে দেখাবো।

কথা মতো সন্ধ্যার পর মন্দিরের সিড়িতে বসে রইলাম।

সবাই চলে যেতেই রোহিত এসে বললো, চাবি রেখেছি। চলুন, আপনাকে মন্দিরের ভেতরটা ঘুরিয়ে দেখাবো। সিড়ির শেষ ধাপের পরেই পাথরের দেয়ালে মূল প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথ থেকেই দেখা যায় বড় আকারের মঞ্চের ওপর স্থাপিত কষ্টি পাথরের ভেংকটেশ্বরের সুবিশাল মূর্তি। মূর্তির মুখায়বে অদ্ভুত চাতুর্যপূর্ণ হাসি খেলা করছে। তাকালেই কেমন যেন অস্বস্তি হয়। পাথরের মঞ্চের সামনেই বিশাল ফাকা স্থান। একত্রে শ দুয়েক লোক বসতে পারবে। চারপাশের পাথরের দেয়ালের নানান স্থানে অতি যত্নে বিবসনা স্বাস্থ্যবান যুবক-যুবতীর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবয়ব নির্মাণ করা হয়েছে। মাঝে মধ্যে সন্তানসম্ভবা রমণীদের হাস্যোজ্জ্বল স্থাপত্যকর্ম। মাথার অনেক উপরে কালো সমতল ছাদ। সেখানেও সন্তানসম্ভবা যুবতীদের চিত্র আকা।

রোহিতকে বলি, এই বিশাল মন্দিরের একজন পুরোহিত হিসাবে তোমার তো ভালো আয় রোজগার হওয়ার কথা।

রোহিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, স্যার, বারো চোদ্দ বছর আগেও এখান থেকে পূজোর দক্ষিণা বাবদ নগদ আর নানান দ্রব্যাদি মিলিয়ে যা পাওয়া যেতো তাতে সকল পুরোহিতের পরিবারই স্বচ্ছলভাবে চলতে পারতো। কিন্তু গত প্রায় বারো বছর ধরে ভেংকটেশ্বর সন্তানহীনাদের গর্ভবর্তী করতে পারছেন না। ফলে সারা ইনডিয়া থেকে এখানে সন্তান আকাঙ্ক্ষী মহিলাদের আসা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। তাই আমাদের রোজগারেও ভাটা পড়েছে। বৃদ্ধ বাবা-মা আর ছোট চার ভাইবোনের সংসারের ভার আমাকেই টানতে হয়। শিক্ষা-দীক্ষা কম। তাই পৌরহিত্যের পাশাপাশি হোটেলের অল্প আয়ের সাধারণ কাজ করেই আমাকে সকলের অন্নের সংস্থান করতে হয়।

আমি বিস্তারিত জানতে ভেংকটেশ্বরের মূর্তির দিকে ইঙ্গিত করে সতর্কতার সঙ্গে বলি, আচ্ছা রোহিত, দেবতার ক্ষমতা কি কখনো কমে যায়! যে দেবতা বছর পনেরো আগেও নিঃসন্তানদের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন, এখন হঠাৎই বা কেন তা বন্ধ করে দিলেন?

রোহিত লাজুক হাসি হেসে বললো, স্যার, আপনাকে আসল রহস্য বলে দিচ্ছি। গত কয়েকশ বছর ধরে মন্দিরের সুদিনকালে আশ্বিনের তিথিতে সারা ইনডিয়া থেকে প্রতি বছর চল্লিশ পয়তাল্লিশজন, কখনো এর চেয়েও বেশি বিবাহিতা মহিলা আসতেন এখানে পূজো দিতে। আশ্বিন-কার্তিক এ দুই মাস ধরে পূজো চলতো। রোজ সন্ধ্যায় মেয়েরা মন্দিরের পাশের দিঘিতে স্নান করে সাধ্য মতো সুসজ্জিত হয়ে জবা ফুল, মিষ্টান্ন আর দুই সের সাড়ে পনেরো ছটাক চাল নিয়ে মন্দিরের ভেতরে ভেংকটেশ্বরের সামনে পদ্মাসনে বসতেন। পুরোহিতরা মন্দিরের দরজা বন্ধ করে নিঃসন্তান রমণীদের জন্য নানান মন্ত্রচারণ করে ভেংকটেশ্বরের কাছে

সন্তান কামনা করতেন। এই সময়ে ঘণ্টা খানেক ধরে সমবেত মেয়েদের ছোট ছোট পাত্রে গঙ্গাজল পান করানো হতো। সেই গঙ্গাজলের বেশির ভাগটাই থাকতো চোলাই করা কড়া দেশি মদ এবং নানান প্রকার সুগন্ধীযুক্ত স্নায়ু বিবশ করা আড়ক। দফায় দফায় সেই গঙ্গাজল পান, ঢাকের গুরুগম্ভীর নিনাদ, ধূপ–ধুনোর তীব্র গন্ধে মেয়েদের স্বাভাবিক চেতনা অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে আসতো। সেই বিবশ মহেন্দ্র ক্ষণে প্রধান পুরোহিতের ইঙ্গিতে রুমের সমস্ত প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে দেবতার পেছন দিকের গোপন দরজা দিয়ে সকল পুরোহিত প্রস্থান করতেন।

এরপর পুরোহিতরা দিগম্বর হয়ে বিভিন্ন দেবতার মুখোশ পড়ে পুনরায় রুমে প্রবেশ করে সম্মোহিত মহিলাদের সঙ্গে মিলিত হতেন। মহিলাদের ধারণা দেয়া হতো, পুরোহিতদের সনির্বন্ধ আহ্বানে বিভিন্ন দেবতা নিঃসন্তানদের সন্তানবতী করতে ধরাধামে মন্দির প্রকোষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছেন। দুই মাস ধরে স্বর্গীয় দেবতাদের অন্তরালে প্রতারক নরদেবতাদের সঙ্গে অবাধ মিলনের ফলে শতকরা ষাট সত্তর ভাগের মতো মেয়ে গর্ভবতী হয়ে যেতো। এই অবস্থায় তারা নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যেতো এবং যথাকালে সন্তান প্রসব করে পরিবারকে নির্বংশ হওয়া থেকে রক্ষা করতো। শ শ বছরে এভাবে ভেংকটেশ্বর অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান।

রোহিত একটু কেশে আলো–আধারিতে অধিষ্ঠিত ভেংকটেশ্বরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলতে শুরু করে, সন্তান আকাঙ্ক্ষায় গৃহবধূরা ছাড়া পতিতারাও আসতো। তাছাড়া পরে বোঝা গেল, বেশ কয়েক বছর ধরে কতিপয় বেহায়া পুরোহিত প্রচুর টাকার বিনিময়ে নিকটবর্তী শহরের কিছু দুষ্ট লোককে দেবতার মুখোশ পড়ে আনন্দ উপভোগের সুযোগ করে দিয়েছিল।

যাই হোক। বছর পনেরো আগে চারজন পুরোহিত নানান রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। স্থানীয় চিকিৎসায় সুস্থ না হওয়াতে তাদের শহরে পাঠানো হয়। সেখানে নানান পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর ডাক্তাররা জানালেন, পুরোহিত চারজন এইডস রোগে আক্রান্ত! এর ফলে পুরোহিত পল্লিতে আতংক উপস্থিত হলো। কিছু দিন পর আরো দুজন আক্রান্ত হলো। এইডস থেকে বাচতে গোপনে পুরোহিতরা আশ্বিন, কার্তিকের পূজার সময় কনডম ব্যবহার করতে শুরু করলো। কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ কাউকে কিছু জানালো না। প্রত্যেকেই ভাবলো আমি নিজেকে নিরাপদ রাখি, অন্যরা দেবতার ভূমিকায় অভিনয় করে যাক! এর ফলে নিঃসন্তান রমণীদের ওপর আর ভেংকটেশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হলো না। রমণীরা অন্তঃসত্ত্বা না হওয়াতে ভেংকটেশ্বরের খ্যাতি লোপ পেল।

এখন এখানে আশ্বিন–কার্তিক এ পূজা দিতে আর কেউ আসে না। আমাদের আয়–রোজগার বন্ধ হয়ে গেল। অন্নের সংস্থান করতে দেবত্ব ত্যাগ করে হোটেলে চাকরি নিতে বাধ্য হলাম।

বংশ পরম্পরায় এই জালিয়াত পুরোহিত চক্র কিভাবে দেবতা সেজে অসংখ্য রমণী আর তাদের পরিবারকে প্রতারিত করেছে তা জেনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ভেংকটেশ্বরকে নমস্কার করে রোহিত প্রদীপখানা তুলে নেয়।

আমি নীরবে তাকে অনুসরণ করে অদ্ভুত হাসিভরা মুখের ভেংকটেশ্বরকে পেছনে ফেলে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি।

বরিশাল থেকে

অসম সুখ

– মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ

আমার হোমিও ফার্মাসিটার সামনেই পানের দোকান নিয়ে বসতো বজলু। এতে করে ফি–বাজার ইজারা দুই টাকা বেচে যেতো তার।

আমার জীবনের সাইত্রিশ বছরে চুয়াত্তরটি ঈদের সঙ্গে একটি ঈদের প্রায় অর্ধাংশের আনন্দটুকুতে শরিক ছিলাম। এখনো চোখের কোণে আবেগ তৈরি করে।

বজলুর বোনটার সঙ্গে পরিচয় আড়াই মাসের। সপ্তাহে দুই হাটবারে সে এসে আমার ফার্মাসিতে বসে অপেক্ষা করতো, তার ভাই বাজার-সওদা কিনে দিতো। চতুর্দশী বালিকার পক্ষে বাজারের ভেতরে ঢোকার মতো সংস্কৃতি আমাদের দেশে নেই, নিষেধাজ্ঞা আছে। কেননা ততোদিনে মেয়েটার শরীরের পরিবর্তনে ঘোষণা হচ্ছিল, তোমার যে মেয়েবেলার শুরু, ছেলেদের সংস্পর্শে থেকে ক্রমেই ষাট হাত দূরে থাকতে হবে। গায়ের মাহরাম পুরুষদের দেখাও হারাম।

কিন্তু তার মনে যে ভালো লাগার ঝড়ের পূর্বাভাস সেটি তার থেকে মাত্র চার হাত দূরে থেকেও বুঝিনি।

বুঝলাম। যখন সে আমাকে চমকে দিয়ে বললো, *আমার নাম জুসনা, আপনেরে ঈদের নিমন্ত্রণ, আগামী কাইল অবশ্যই আসবেন। না আসলে আমি ভীষণ গোস্বা করবো...।*

একটা ভিউকার্ডে লেখাগুলো ছিল, মেয়েলি হাতে লেখা ভাঙা ভাঙা অক্ষরে। বানান ভুলটা স্বাভাবিক। অন্য পৃষ্ঠায় বাংলা সিনেমার জনৈক নায়ক-নায়িকার জড়াজড়ি করে থাকা ছবি।

ওই মুহূর্তে হ্যা, না কিছুই বলা সম্ভব না থাকলেও মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম।

জ্যোৎস্না তাগাদা দেয়, মাথা ঝাকালে চলবে না, তার হাত ধরে কথা দিতে হবে।

তার ছোট, কোমল, উষ্ণ, ঘর্মাক্ত হাতে ছুয়ে বললাম, যাবো।

তার চোখ-মুখে, আনন্দের রাশি রাশি আলো, ফুল যেন ঝরে পড়ছে। পরের দিনের ঈদের আনন্দ, আজকের আনন্দ মিলে গাইছিল আনন্দ সঙ্গীত।

ঈদের দিন, নামাজ শেষে এক কেজি মিষ্টি আর দুই ডজন লাল রেশমি চুড়ি কিনে জ্যোৎস্নার বাড়ি পৌছালাম। তাদের উঠান পর্যন্ত পৌছে দাড়াতেই জ্যোৎস্না ঘরের ভেতর থেকে দৌড়ে এসে আমাকে টেনে নিয়ে ঘরে বসালো। হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে বার বার জিজ্ঞাসা করছিল, *আসার সময় কষ্ট অয় নাই তো? আমি কি যে খুশি হইছি কইতে পারুম না।*

তার মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করতেই তার হাসি ভরা মুখে দুঃখের ছাপ দেখলাম। আনত জ্যোৎস্না বললো, তার মা নেই। মারা গেছে তার দেড় বছরের সময়ে।

নিজে একটু অপ্রস্তুত হলাম। তার বাবা এসে আমার পাশে বসে মেয়েটার দুরন্তপনার কথা বর্ণনা দিলেন।

খেতে বসলাম। জ্যোৎস্না মুরগি কিনে তা পাকিয়েছে এবং রান্নার হাতটাও চমৎকার।

খাবার শেষে পানদানি এগিয়ে দিয়ে জ্যোৎস্না আমাকে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে বললো।

পান খেতে খেতে তার পানদানিতে পঞ্চাশ টাকা এবং চুড়ির প্যাকেটটা রাখতেই তার চোখে-মুখে আনন্দের জোয়ার লক্ষ্য করলাম।

এক নিমেষে চুড়িগুলো হাতে পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, *বাহ! আপনের পছন্দের লগে আমার পছন্দের মিল আছে।*

বিছানায় শুয়ে ভাবছি এসবের পরিণতি কি হবে। আমি তার জীবনটাকে এলোমেলো করে দিচ্ছি না তো?

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম সে কাদছে।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই সে তার জামার বুকের কাছ থেকে একটা পুরুষ মানুষের রঙিন ফটো বের করে বললো, *এই লোকটার লগে কাইল আমার বিয়ার কাবিন অইবো। আগামী কাইলও আপনেরে আসতে অইবো কষ্ট কইরা।*

সে যাত্রায় হ্যা বলা সম্ভব হলো না। কেন হলো না তার ব্যাখ্যা এখানে করে লাভ নেই।

নীরবে চলে আসার সময় দেখলাম, জ্যোৎস্নার চোখে জল, মুখে–বুকে ঝড়। সে ঝড় আমাকে ক্রমেই ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে...। পবিত্র ঈদের ছোয়ায় অতি আনন্দের সমাবেশে হয়তো তারই প্রকাশ। সে আনন্দে ক্রমাগত আমি বিকশিত হচ্ছি...।

সেই জ্যোৎস্নার এখন চার সন্তানের জননী, ভগ্ন দেহ নারী, চোখের নিচে কালি, গায়ে দুরারোগ্য স্কিন ক্যান্সার। তার জীবনে এভাবে ঈদ কি আর আসে? হয়তো আসে, কিন্তু আনন্দের ঝড় তোলে না।

আমার কাছে নিঃসংকোচে বললো সব। চিকিৎসার উদ্দেশ্যেই আমার ফার্মাসিতে এলো দীর্ঘ দশ বছর পর। জ্যোৎস্নার স্বামী একজন মাতাল এবং জুয়াড়ি। প্রথম সন্তানটি গর্ভেই নষ্ট হয়ে যায়। এরপর থেকে শরীর ও মন ভাঙতে থাকে জ্যোৎস্নার। তবুও একের পর এক সন্তান আসতে থাকে। স্বামীর হার্নিয়ার অপারেশন হয়েছে। যে নিয়মিত পতিতালয়ে যেতো। পরিণামে জ্যোৎস্নার শরীরও যৌন রোগে আক্রান্ত। তাকে সারোনো সম্ভব কি না ভাবছি...।

যাই হোক, অন্তত প্রতি ঈদে যেন সে আনন্দে থাকে।

শ্যামগঞ্জ, ময়মনসিংহ থেকে

দেশে দেশে

- শাহজাহান সিকদার মানু

অনেক কষ্টের পাথর বুকে নিয়ে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে, আপনজন ছেড়ে, প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে আমরা প্রবাসী। অনেকগুলো দেশে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। দেখেছি বিভিন্ন জাতি, তাদের বিভিন্ন ভাষা–সংস্কৃতি ও কৃষ্টি।

আবু ধাবিতে দুই বছর ছিলাম। দুবাই, শারজাহ, আল আইন ইত্যাদি জায়গায় প্রচুর ঘুরেছি। সুযোগ হয়েছে আরবদের জীবনযাত্রা খুব কাছে থেকে দেখার। আরবরা খুবই শৌখিন ও অতিথি পরায়ণ। কোনো অতিথি এলে তাকে নিয়ে থালা আকারে বড় ডিশের মধ্যে এক সঙ্গে খাওয়া–দাওয়া করে। উটের মাংস, বড় মাছ ও ফল এদের প্রিয় খাদ্য। আরবরা প্রচুর ফল ও খেজুর খায়। এরা খুবই আরাম প্রিয়। কর্মঠ না। অফিস–আদালত, ব্যবসা–বাণিজ্যে অধিকাংশেই বিদেশিদের অংশ আছে। তেল ছাড়া এদের অন্য কোনো সম্পদ নেই। দেখেছি আরব শেখরা ভোগবিলাস করতে গিয়ে কিভাবে দুই হাতে টাকা খরচ করে। পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি ভোগবিলাস করতে গিয়ে এতো অপব্যয় করে কি না জানি না।

জাপানে আড়াই বছর থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল। দেখেছি জাপানিজরা কি কর্মঠ জাতি। এরা খুবই পরোপকারী। রাস্তাঘাটে কোনো বিদেশি কোনো সমস্যায় পড়লে পাগলের মতো উপকার করতে চায়। যখন প্রথম টোকিওর হানাদা এয়ারপোর্টে নামি, এয়ারপোর্টের বাইরে এসে অবাক হয়ে গেলাম ঝকঝকে, তকতকে রৌদ্রোজ্জ্বল জাপান দেখে। ট্যাকসি ড্রাইভারকে ঠিকানা দেখালাম।

সে আমাকে বললো, কাছেই ট্রেন স্টেশন, ট্রেনে গেলেই ঠিকানা মতো পৌছে যাবেন।

ট্যাকসিতে উঠে বসলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্রেন স্টেশনে পৌছে গেলাম। তখন ইয়েনের হিসাব এতো বুঝি না। এয়ারপোর্টে নেমে ডলার ভাঙিয়ে ইয়েন নিয়েছিলাম।

ট্যাকসি ড্রাইভারকে কতোগুলো ইয়েনের নোট হাতে দিয়ে বলেছিলাম, এখান থেকে তোমার ভাড়া বুঝে নাও। জাপানিজ ট্যাকসি ড্রাইভার শুধু একটা নোট রেখে সবগুলো নোট আমাকে ফেরত দিয়ে দিল। এবং হাসি মুখে আমি ধন্যবাদ দেয়ার আগেই মাথা নুইয়ে সে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল।

অবাক হয়ে গেলাম আমাদের দেশের এয়ারপোর্ট ও যানবাহন ড্রাইভারদের কথা চিন্তা করে। এই সততা কবে আমাদের মাঝে আসবে? জাপানের ট্রেন স্টেশনগুলো এতো বড় যে, কাছ থেকে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে

না। মাটির নিচেও চার পাচ তলা পর্যন্ত ট্রেন স্টেশন রয়েছে। এক মিনিট অন্তর ঝাকে ঝাকে ট্রেন আসা-যাওয়া করছে। সব কিছুই নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলছে। কোথায়ও অনিয়ম নেই।

আড়াই বছর জাপানে থাকতে গিয়ে অনেক কিছুই দেখেছি, শিখেছি এবং জেনেছি।

একদিন ট্রেনে করে টোকিও থেকে ইয়োকোহামা যাচ্ছি। আমার অপরদিকের সিটে একটি ছোট ফুটফুটে মেয়ে ও তার মা বসা। মেয়েটির বয়স সম্ভবত চার কি পাচ বছর হবে। দেখলাম শিশুটিকে একটি চকলেট খেতে দিলেন।

মেয়েটি চকলেটের মোড়ক খুলে চকলেটটি মুখে পুরে কাগজের মোড়কটি হাতের মধ্যে রেখে দিল। দীর্ঘক্ষণ মেয়েটি ওই চকলেটের কাগজটি ওই হাতের মধ্যেই রাখলো।

কৌতূহলী হয়ে মাঝে মধ্যে তাকিয়ে দেখছিলাম সে ওই কাগজটি কি করে?

এক সময় ইয়োকোহামা স্টেশন এসে পড়লো। মা ও ছোট শিশুটি নেমে পড়লো।

আমিও তাদের পেছনে নেমে হেটে এগোচ্ছি। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, ছোট মেয়েটি স্টেশনের একটি ডাস্ট বক্সে তার হাতের মধ্যে রাখা চকলেটের কাগজটি ফেলে এলো।

এখানে মায়ের কোনো ভূমিকা ছিল না। নিজেই এই কাজটি করলো।

অবাক হয়ে ভাবলাম, আমার দেশের ছেলে-বুড়ো অনেকেই যত্রযত্র এটা-ওটা ফেলে, অথচ এই ছোট চার পাচ বছরের মেয়েটির কাছ থেকেও যে অনেক কিছু শেখার আছে তা কি কেউ অস্বীকার করবেন?

আগেই বলেছি, জাপানিজরা কর্মঠ জাতি। সময়কে এরা অত্যন্ত দাম দেয়। সময়ানুবর্তিতা, কর্ম ও সততার জন্য জাপান এশিয়ার প্রথম কাতারের শিল্প উন্নত দেশ। একটি প্রতিষ্ঠিত ইলেকট্রিক কম্পানিতে চাকরির সুযোগ আমার হয়েছিল। দেখেছি তারা কিভাবে নিত্য নতুন জিনিস উদ্ভাবন করে। বিশ্ব বাজারে টিকে থাকার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। অত্যন্ত নিখুত এক্সপেরিমেন্ট তাদের। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

একবার কম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মি. জুম আমার অ্যালবামে মতিঝিলের একটি ছবি দেখে বলেছিলেন, এগুলো কি তোমাদের দেশের কলকারখানা?

বলেছিলাম এগুলো অফিসপাড়া।

তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

এতো অফিস! তাহলে তো অনেক কলকারখানা থাকার কথা।

তার কথার সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। কারণ যে দেশে কলকারখানার চেয়ে অফিস-আদালত বেশি সে দেশে প্রডাকটিভ কিছু কি করে আশা করা যায়? আমাদের এই গরিব দেশে যে পরিমাণ জিনিস আমদানি হয় তার তুলনায় কতোটুকু জিনিস রফতানি হয়? পরনির্ভরশীল হয়ে কোটি কোটি ডলার বিশ্ব ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে আর যাই হোক স্বনির্ভর জাতি হওয়া যায় না।

জাপানের একজন এমবিবিএস ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে লক্ষ্য করেছি, তিনি ভালো ইংরেজি বলতে পারেন না। তাই বলে এটা তাদের দৈন্যতা নয়। নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের প্রেম গভীর। আমাদের দেশে ভালো করে ইংরেজি বলতে না পারলে তাকে বলা হয় অশিক্ষিত। অথচ এ বাঙালিই মাতৃভাষার জন্য রক্ত দিয়ে পৃথিবীর বুকে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে!

জাপানিজরা প্রচুর কাচা ও আধা সিদ্ধ খাবার খায়। ঝাল ও তেল অপছন্দ করে।

সিংগাপুর ভ্রমণে আমার দুইবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সিংগাপুর শহরটা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সমস্ত শহরটা দেখলে মনে হবে টুরিস্টদের আড্ডাখানা। সিংগাপুরের সরকার টুরিস্টদের নিত্য নতুন সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে।

মালয়শিয়াতে একটি জাপানিজ ইলেকট্রনিক্স কম্পানিতে তিন বছর থাকার সুযোগ হয়েছিল। ড. মাহাথির মোহাম্মদকে আধুনিক মালয়শিয়ার জনক বলা হয়। কথাটা শতকরা একশ ভাগ সত্য। সঠিক নেতৃত্ব-সততা-প্রজ্ঞা ও মেধার প্রভাবে একটি জাতি কতো দ্রুত উপরে উঠতে পারে, মালয়শিয়া তার প্রমাণ।

১৯৯১ সালের দিকে ভ্রমণের জন্য পাকিস্তান গিয়েছিলাম। পাচ দিনের মতো পাকিস্তানে ছিলাম। করাচির মধ্যম শ্রেণীর একটি হোটেলে উঠেছি। তখন সেখানে প্রচণ্ড গরম। হোটেলের এয়ারকনডিশন্ড রুম ছেড়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়লো। পাকিস্তানে ফল খুব শস্তা। করাচির রাস্তায় হাটি আর এক ঘণ্টা অন্তর বিভিন্ন ফলের জুস খাই। পাকিস্তানিদের প্রধান খাদ্য রুটি। আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি। মাছ-ভাত-ডাল না খেলে মনে হয় কিছুই খেলাম না। মনে আছে, ভাত পাওয়া যায় এমন একটি রেস্টুরেন্ট খুজে বের করতে আমার আধা ঘণ্টা লেগেছিল। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, পাকিস্তানিরা খুব তেল ও মরিচ খায়। তাদের ভাষায় *তেল আওর মরচে মে তাকত হ্যায়।*

ইনডিয়াতে গিয়েছি বেশ কয়েকবার। কলকাতার বাঙালিরা আমাদের বাংলাদেশের বাঙালিদের বেশ সমীহ করে চলে। একবার এক রাত চন্দননগর রবীন্দ্র সদনে ছিলাম। পরের দিন ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন ২৫ বৈশাখ। ঘুম ভেঙে গেল ভোরবেলা রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর শুনে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি নিচে রবীন্দ্র মঞ্চে ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে নৃত্য পরিবেশন করছে।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিচে এসে শিল্পীদের নাচ দেখলাম। পরে চন্দননগর রেল স্টেশনে অপেক্ষা করছি হাওড়ার ট্রেন ধরার জন্য। হঠাৎ শুনতে পেলাম আমার পেছনেই দাড়িয়ে থাকা দুই কিশোর, সতেরো কি আঠারো বছর বয়স হবে একজন অপরজনকে বলছে, ইশ, আজকে বাংলাদেশে রবীন্দ্রজয়ন্তী যে রকম করে পালিত হচ্ছে তাই না? যদি যেতে পারতাম...।

ওই দুই কিশোরের কথা সেদিন আড়াল থেকে শুনে সত্যি গর্বে বুক ফুলে গিয়েছিল এই জন্য যে, আমি একজন স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলাদেশি বাঙালি।

থাইল্যান্ড গিয়েছি বেশ কয়েকবার। ব্যাংককে দেখার মতো তেমন কিছু নেই। জিনিসপত্র বেশ শস্তা। বিশেষ করে কাপড়-চোপড়, খেলনা। সারা রাত ব্যাংককের রাস্তায় গাড়ি চলে। ব্যাংকক শহরের রাস্তার পাশে প্রচুর ভ্রাম্যমাণ খাদ্যের দোকান। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের অধিক অংশগ্রহণ করতে দেখেছি। থাইদের অধিকাংশই বৌদ্ধ।

ফিলিপিন্সে কয়েক ঘণ্টা ঘোরার সুযোগ হয়েছিল। দেশটিতে সততার চেয়ে শঠতা বেশি লক্ষ্য করেছি। ফিলিপিনো মেয়েরা মুখের চেয়ে চোখে বেশি কথা বলে।

বর্তমানে বেশ কয়েক বছর যাবৎ সাউথ কোরিয়ায় অবস্থান করছি। কোরিয়ানরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাগলের মতো কাজ করে যেতে পারে। আমার কাছে জাপানিজদের চেয়ে কোরিয়ানদের বেশি পরিশ্রমী মনে হয়েছে। কাজ ছাড়া এরা অন্য কিছু বোঝে না। এদের ভাষায়, *কর্মই ধর্ম।* জাপানিজদের এরা পছন্দ করে না। কিন্তু প্রযুক্তিতে পুরোটাই জাপানের অনুকরণ করে। জাপানিজদের মতো কোরিয়ানরা হৃদয়বান নয়। এরা অনেকটা যন্ত্রের মতো। নিজের প্রয়োজন এবং স্বার্থের প্রকার ভেদে এদের ব্যবহারের তাপমাত্রা আপ-ডাউন করে। এ দেশের রাস্তা-ঘাট, বাস-ট্রেনে চলাচল করতে গিয়ে প্রচুর নাগরিক সুবিধা ভোগ করা যায়। প্রতিটি ট্রেন স্টেশন ও বাস টার্মিনালগুলোতে ঝকঝকে, তকতকে বিশ্রামাগার রয়েছে।

কোরিয়ানরা প্রচুর কাচা ও আধা সিদ্ধ মাছ-মাংস, শাক-সবজি খায়। *রামিয়ান* (নুডলস) ও কিমচি এদের প্রিয় খাদ্য। এরা মাছ-মাংস শাক-সবজি দিয়ে প্রচুর সুপ বানিয়ে খায়। শামুক-ঝিনুক, কাকড়া, অক্টোপাস, কুকুর, মৌমাছি এরা সব খায়। এ দেশের ছেলেমেয়েদের বয়স আঠারো বছর হয়ে গেলে, প্রেমিক-প্রেমিকা নিয়ে

চলাফেরা করে, লিভ টুগেদার করে। বাবা–মায়ের তরফ থেকে কোনো বাধা–নিষেধ নেই। এরা আনুষ্ঠানিক বিয়ে করে প্রায় মধ্য বয়সের শেষ দিকে।

সাউথ কোরিয়া থেকে
shahjahan_sikder2000@yahoo.com

বাথরুম সমাচার

- ফয়সেলুজ্জামান

ঘটনাটি গত রোজার ঈদের।

ঘটনাটি বলার আগে আমাদের বাড়ি সম্পর্কে একটু বর্ণনা দেয়া প্রয়োজন। আমাদের বাড়িটা দোতলা। নিচ তলা ভাড়া দেয়া এবং নিচ তলায় বাথরুম দুইটি। আমরা থাকি দোতলায় এবং দোতলাতেও রয়েছে দুটি বাথরুম। নিচ তলায় একটি জয়েন্ট ফ্যামিলি ভাড়া থাকে। সেই ফ্যামিলির একজন সদস্য হচ্ছে শামুক।

তাকে খুবই পছন্দ করি। কিন্তু কখনো মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনি। যদিও আমার কর্মকাণ্ডে সে বোধহয় বুঝতে পারতো যে, তাকে আমি পছন্দ করি। সে হচ্ছে আমার এক ইয়ারের ছোট।

যাহোক, ঈদের নামাজের জামাত ছিল আটটার সময়। ঈদের আগের দিন রাতে আব্বু, আম্মু, ছোট বোন ও আমিসহ সবাই আড্ডা শেষ করে একটু রাত করেই ঘুমাতে গিয়েছিলাম। ফলে সকালে ঘুম থেকে জাগলাম সাড়ে সাতটায়। তাও তলপেটে বড় কাজটার অনুভূতি পেয়েই ঘুম থেকে উঠেছিলাম।

উঠেই ব্রাশ, টাওয়েল হাতে নিয়ে বাথরুমের দিকে ফর্মুলা ওয়ান কারের স্পিডে ছুটলাম।

একদিকে তলপেটের কার্গো খালাস করার তাড়া, তার ওপর নামাজ পড়ার তাড়া। কিন্তু গিয়ে দেখি দুটি বাথরুমই বুকড। একটিতে আব্বু, অন্যটিতে ছোট বোন। এবং কেউ–ই পনেরো বিশ মিনিটের আগে বের হতে পারবে না।

লাজ–শরমের মাথা খেয়ে কোনো চিন্তা না করে টিম মন্টগোমরির একশ মিটার স্প্রিন্টের রেকর্ড ভঙ্গ করার লক্ষ্য নিয়ে সিড়ি ভেঙে নিচ তলার কাকিদের বাসায় গেলাম। গিয়ে একটি বাথরুম খালি পেলাম এবং সেটাতে ঢুকে শান্তি পেলাম।

কিন্তু সেই ঈদের দিন সকালে ভাগ্য মনে হয় আমার বিপক্ষে থাকবে বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। না হলে কেন কল ঘুরিয়ে দেখবো ট্যাংকের পানি শেষ? তখন বাজে পৌনে আটটা। মোটরের শব্দ শুনে বুঝলাম মোটর ছাড়া হয়েছে। তারপরও পানির জন্য অন্তত পাচ মিনিট অপেক্ষা করা লাগবে। কারণ কলে পানি আসতে একটু সময় নেয়।

যখন অপেক্ষার প্রহর গুণছি তখনই দেখি বাথরুমের দরজার নিচ দিয়ে একটি কাগজ উকি ঝুকি মারছে। ওই অবস্থাতেই কাগজটি নিয়ে খুললাম।

কাগজে লেখা ছিল, সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে আমিই তোকে প্রথমে প্রোপোজ করলাম। হ্যা, তোকে আমি পছন্দ করি। আজকে নামাজ পড়ে এসে আমাকে কয়েক ঘণ্টা সময় দিতে পারবি?

শামুক আমাকে তুই করে বলতো।

চিঠিটা পড়ে ভাগ্যের প্রতি আমার সব রাগ এক নিমেষে চলে গেল।

শেষ কথা হচ্ছে, সেদিন পাচ মিনিট কি চার মিনিট আগে ঈদগাহে পৌছেছিলাম।

ঠিকানা বিহীন

আফ্রিকান কালো মেয়ে

- মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক আরিন্দা

নব্বই দশকের প্রথম দিকের কথা। তখন ফ্রান্সে যতোদিন ইচ্ছা থাকার অনুমতি পেয়ে প্রথমেই মনে মনে ভাবলাম, এ দেশে কোনো একটা কিছু করে বাচতে হলে সর্বপ্রথমে ভাষাটা জানা দরকার। ভূগোলে আমার অজানা যতো কঠিন ভাষা আছে, মনে হলো তার মাঝে ফরাশি ভাষা একটি। ফরাশি ভাষা না জানার কারণে এ দেশে অনেক বিদেশি ভালো কাজ করা থেকে বঞ্চিত হয়।

একজন বাংলাদেশি ভাইয়ের সহযোগিতায় ভাষা শিক্ষা স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম। সেখানে ভাষা শিখতে আসা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশজন নারী-পুরুষের মাঝে সিয়েরা লিওনের দুজন আফ্রিকান কালো মেয়েও আছে।

ফরাশি ভাষা বলতে পারি না বলে ক্লাসে অন্যদের সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় ভাব বিনিময় করার জন্য প্রথমে চেষ্টা করি। এর মাঝে সিয়েরা লিওনের মেয়ে দুটো ভালো ইংরেজি ভাষা বলতে পারে বলে তাদের সঙ্গে ক্লাসের আগে-পরে বা বিরতির সময় ভাবের আদান-প্রদান চলে বেশি। তাদের দেশে নাকি মাতৃভাষার পরে ইংরেজি ভাষা বহুল প্রচলিত। এ জন্যে তারা ভালো ইংরেজি ভাষা বলতে পারে।

ক্লাসে সিয়েরা লিওনের মেয়ে দুটো ছিল সবচেয়ে বেশি হাসি-খুশি, প্রাণবন্ত আর উদ্যমী। আমাদের দেশের কালো মেয়েদের চেয়েও তারা অনেকগুণ বেশি কালো। আমার মাতৃভূমির কালো মেয়েদের জীবনে পদে পদে দুর্দশা দেখে এখানে এসে মেয়ে দুটোর হাশি-খুশি-প্রাণবন্ত আর উদ্যমী ভাব দেখে মনে মনে কৌতূহল অনুভব করতাম।

এখানে এসে একটা বিষয় দেখলাম। বাইরে কোনো কিছু খাওয়ার সময় পাশে কোনো আফ্রিকান লোক থাকলে তাকে খাওয়ার জন্য অফার করলে না বলতে দেখিনি। তাই ক্লাসের বিরতির সময়ে একদিন মেশিনে পয়সা ঢেলে গরম কফি বের করে খাওয়ার সময় দেখি মেয়ে দুটি আমার দিকে চেয়ে আছে।

তাদেরকে কফি পানের আমন্ত্রণ জানালে সঙ্গে সঙ্গে তারা অবশ্যই বলে রাজি হয়ে গেল।

কফি খাওয়ার সময় তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, তাদের একজন সে দেশে গৃহযুদ্ধে মা-বাবা, ভাই-বোন সব হারিয়ে এ দেশে চলে এসেছে।

তার কথা শুনে আমার হৃদয়ের সহানুভূতি প্রকাশ করতে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, এতে দুঃখ করার কিছু নেই। কেননা আগে-পরে একদিন সবাইকে মা-বাবা হারাতে হয়।

আরেকজন সে দেশে গৃহযুদ্ধে জীবন দুর্বিষহ বলে ফ্রান্সে চলে এসেছে। এবং এখানে এসেই তাদের দুজনের পরিচয়ের পর বন্ধুত্ব হয়েছে।

কথার ফাকে একজন আমার সম্বন্ধে জানতে জিজ্ঞাসা করলে আমি বিবাহিত কি না।

না বলে তাদের কি অবস্থা জানতে চাইলে তারা বললো, আমরাও অবিবাহিত।

শুনে মজা করতে বললাম, তাহলে তো জানাই হলো, যদি তোমরা দুজনে আমাকে বিয়ে করে নাও তাহলে আজীবন তিনজন মিলে এক সঙ্গে থাকতে পারবো।

শুনে *অসম্ভব অসম্ভব* বলে দুজনে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লো।

আরেকদিন দুপুরে খাওয়ার জন্য ক্লাস থেকে বেরিয়ে দেখি, তারা গেটের সামনে বসে আছে। খেয়ে এসেও দেখি তারা সেখানেই বসে আছে। তা দেখে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই?

শুধু মাথা নিচু করে বললো, না।

সঙ্গে সঙ্গে আমার পকেটে থাকা পচিশ ফ্রাংক বের করে দিয়ে বললাম, যাও, কিছু খেয়ে এসো।

এই বিশ ফ্রাংকের বিনিময়ে এরপর থেকে তারা আমাকে একজন ভালো ছেলে বলে ভাবতে লাগলো এবং অনেকটা কাছের মানুষের মতো ব্যবহার করতে লাগলো।

পরে ক্লাসের আগে বা পরে রাস্তায় সুযোগ মতো দুজনকে হাটতে দেখলে শুধু মনের কৌতূহল নিবারণ করতে পেছন থেকে গিয়ে দুজনের কাধের ওপর হাত রেখে বলতাম, বন্ধুরা, কেমন আছো?

তারপর এভাবেই কথা বলতে বলতে অনেক দূর এগিয়ে যেতাম।

প্রথম দিন মেয়ে মানুষ বলে কিছুটা চমকে গেলেও পরে কোনো কিছু মনে করা দূরের কথা, মনে হতো তাতে তারা ভালোই পুলুক অনুভব করতো। এবং পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষ যে শুধু মানুষ তা তাদের ভাবে প্রকাশ করতো।

একদিন ক্লাস শেষে এভাবে তাদের সঙ্গে মজা করে যাওয়ার সময় বললো, মুজাম্মেল, আগামী শনিবারে রাতে আমাদের সঙ্গে তুমি ডিস্কোতে যাবে?

ফ্রান্সে তখনো কোথাও কোনো ডিস্কোতে যাইনি। কাজেই কোনো কিছু চিন্তা না করে বললাম, হ্যা যাবো। তবে কোথায়?

বললো, মেট্র রিপাবলিক।

কোন জায়গায় প্রথমে আমরা মিলিত হয়ে তারপর গিয়ে ডিস্কোতে ঢুকবো তা নির্ধারণ করে চলে এলাম।

আমার একটা স্বভাব হলো, বাইরে আমার ব্যক্তিগত জীবনে কি করি, না করি, তা বাসায় এসে আগে-পরে কাউকে বলি না।

কাজেই সেদিন রাতে বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় শুধু একজনকে বললাম, আজ রাতে মনে হয় আমার বাসায় ফেরা হবে না।

আমার ফিটফাট ভাব দেখে সে জানার কৌতূহলি শুধু জিজ্ঞাসা করলো, কেন?

বললাম, এমনিতেই। রাতের প্যারিস দেখার খুব শখ, তাই বলে বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম।

বেরিয়ে দেখি তারা আমার আসার আগেই নির্দিষ্ট জায়গায় এসে উপস্থিত। আমাকে পেয়ে ভারী খুশি। কিছু খাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে তাদেরকে নিয়ে শস্তায় পেট ভরে খাওয়ার জন্য একটা টার্কিশ রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকলাম।

ভোজন শেষে আলাপচারিতায় মাঝে একজন আমাকে প্রশ্ন করলো, মুজাম্মেল, আমাদের দুজনের মাঝে কাকে তোমার বেশি ভালো লাগে?

শুনে মনে মনে হাসলাম এই ভেবে, আমাদের দেশে এর চেয়ে কতো কম কালো মেয়েকেই বিয়ে করতে চায় না আর যদি তাদের একজনকে বিয়ে করে দেশে নিয়ে যাই তাহলে প্রথমেই সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, একে আফ্রিকার কোনো জঙ্গল থেকে তুই উদ্ধার করে নিয়ে এলি।

কিন্তু সে কথা তো তাদেরকে বলা যাবে না। কারণ তাতে তারা মনে কষ্ট পাবে। এবং আমাদের দেশের মানুষের মনোভাবের জন্য তাদেরকে ঘৃণা করতে শিখবে। কাজেই প্রশ্ন এড়াতে বললাম, এখনো ভালোভাবে ভেবে দেখিনি।

তবুও জেরার মুখে পড়ে বাচতে বললাম, এখন না পরে বলবো। বলে তাদের নিয়ে ডিস্কোর উদ্দেশ্যে উঠে পড়লাম।

প্যারিসের ভালো ডিস্কোগুলোতে আফ্রিকার এলজেরিয়া, মরক্কোর ছেলেগুলোর দৌরাত্মের কারণে মেয়ে ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেয় না। কিন্তু এ কথা মেয়েদের বেলায় খাটে না। মেয়ে বলে তাদের ঢুকতে বাধা নেই।

কাজেই মেয়ে দুটো আমাকে তাদের সঙ্গী বলে টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে গেল। সেখানে তারা গানের তালে তালে নাচতে লাগলো এবং আমাদেরকেও তাদের সঙ্গে নাচার জন্য আমন্ত্রণ জানালো।

নাচে আমার অনীহা। তার ওপর আমি শারীরিকভাবে কিছুটা পঙ্গু। কাজেই তাদের আমন্ত্রণ সবিনয়ে ফিরিয়ে শুধু দাড়িয়ে দাড়িয়ে সবার নাচ দেখতে লাগলাম।

সকালে বাসায় ফিরে এলাম।

সে রাতের মতো আরেক রাতেও তাদের সঙ্গে ডিস্কোর আনন্দের ভাগীদার হয়েছিলাম।

এভাবে চার মাস গত হয়ে যাওয়ার পর একদিন ক্লাসে গিয়ে দেখি তাদের মন খুব খারাপ।

কারণ জানতে চাইলে তারা বললো, ক্লাসের শেষে বলবে।

ক্লাসের শেষে রাস্তায় এসে একজন আমাকে কাদো কাদো কণ্ঠে বললো, মুজাম্মেল, আমাদের আর এখানে ভাষা শেখা হচ্ছে না।

কারণ জানতে চাইলে বললো, তারা যে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে থাকে সেখানে আর থাকতে পারবে না। যদি এখানে থাকতে চায় তাহলে তাদের ব্যক্তিগতভাবে বাসা খুজে নিতে হবে। অন্যথায় অন্য জায়গায় দূরে সরকারিভাবে তাদের সরিয়ে নিয়ে নতুন লোকজনকে এখানে এনে তুলবে।

তাদের কোথায় সরিয়ে নিয়ে যাবে জানতে চাইলে বেশ দূরের একটা শহরের নাম বললো। সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

শুনে চুপ করে রইলাম কিছু না বলে।

পরের দিন বিকেলে তাদের সে শহরের উদ্দেশ্যে সরকারি বাসে যাত্রা। তাই সকালে ক্লাসে এসে সবার থেকে বিদায় নিল। আমি তাদের সঙ্গে গিয়ে বাসে উঠিয়ে দিলে তারা খুশি হবে ভেবে তাদের সঙ্গে গেলাম।

নির্দিষ্ট সময়ে বাস এসে উপস্থিত হলে একে একে সবাই বাসে গিয়ে বসতে শুরু করলো।

তারা আমার থেকে বিদায় নেয়ার সময় ঠিকানা দিয়ে বললো, আমি যেন তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি।

আমার পক্ষে তখন তা অসম্ভব। তাই তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস না দিতে আমার অপারগতার কথা বললে, একজন আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, তাহলে আর কোনোদিন তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে না! বলে আমার গলায় ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

অন্যজন পাশে দাড়িয়ে চোখের পানি মুছতে লাগলো।

এই দৃশ্য আশপাশের বিভিন্ন দেশের লোক হা করে চেয়ে দেখতে লাগলো, আর আমি লজ্জায় মনে মনে নিজেকে খুব ধিক্কার দিতে লাগলাম।

শেষে তাদেরকে বিদায় দিয়ে রাস্তায় এসে নিজে নিজে ভাবতে লাগলাম, হায়, আমি তাদেরকে কি ভেবেছি আর তারা আমাকে কি ভেবেছে! আমিও তাদেরকে নিছক আফ্রিকান কালো মেয়ে ভেবে এতোদিন শুধু মজা করে এসেছি। কিন্তু তারা আমাকে তাদের একজন ভালো বন্ধু ভেবে এসেছে।

কিন্তু তাহলে? তারা কালো হলে কি হবে? তাদের যে মন আছে, পৃথিবীর অন্য কোনো জাতিতে সে মন খুজে পাওয়া ভার। তাই তো শাদারা তাদের মাঝে সে মন খুজে পেয়ে তাদেরকে এতো ভালোবাসে।

এ জন্য আমরা একটা কালো ছেলের সঙ্গে শাদা মেয়ে যেতে দেখলে মনে মনে হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরে ভাবি, ছিঃ, দেখো কেমন সুন্দর মেয়েটা একটা কালো ছেলের সঙ্গে যাচ্ছে!

কিন্তু উন্নত শাদা জাতির মনও আমাদের চেয়ে উন্নত বলে মানুষকে তারা শাদা-কালো নয়, একজন মানুষ হিসেবে দেখতে শিখেছে। ধর্ম, বর্ণ তাদের কাছে গৌণ, শুধু একজন মানুষ তাদের কাছে মুখ্য। তাই তারা এতো উন্নত।

সেদিনের ঘটনা থেকে শিক্ষা পেয়েছিলাম। এখন কাউকে কালো বলে নিচু ভাবতে বিবেকে বাধে।

আসল কথা হলো, স্রষ্টার সৃষ্টির রহস্য যারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে তারা কখনো গায়ের রঙ শাদা-কালো খোজে না, তারা খোজে সঠিক মন, কায়া, গঠন।

প্যারিস থেকে

হের কানালি

- নওরোজ বানু গার্গী

আমাদের একটি বাড়ির পরেই থাকে এক ইটালিয়ান পরিবার। পরিবার মানে নাতি ডানিয়েল, ডানিয়েলের মা ক্লাউডিয়া, ডানিয়েলের নানি নিনা এবং ডানিয়েলের নানা সি কানালি। আমাদের পাড়ায় হের কানালি-র বাগানটি সবচেয়ে সুন্দর। ছোট বাগানটিতে আপেল গাছ, চেরি গাছ, হরেক রঙের ফুলের গাছ লাগিয়েছেন হের কানালি। প্রতি সামারে তিনি লাগান লেটিস, শশা, জুকিনি টমাটো। পাড়ায় তিনি সবুজ জাতের অধিকারী হিসেবে পরিচিত।

আমরা যখন প্রথম এই পাড়ায় আসি তখন শীতের প্রায় শেষ। বিভিন্ন সুপারমার্কেটে হরেক রকম গাছের বিচি এবং চারা দেখে আমি কিছু টমাটো, জুকিনি এবং মরিচের চারা লাগাই। সে সামারে বেশ গরম পড়েছিল। বাগানের ভালো মাটির গুণে এবং পর্যাপ্ত পানির কারণে আমার চারা গাছগুলো শন শন করে বেড়ে উঠছিল। কিন্তু শাক-সবজি লাগানোর যে কতোগুলো নিয়ম আছে তা কে জানতো! আমার টমাটো গাছগুলো বন্যভাবে বেড়ে উঠছিল এবং তাতে অসংখ্য টমাটো দেখে আমার খুশি দেখে কে!

আমার বাগান দেখে হের কানালি বললেন, ফ্রাও বানু, তোমার টমাটোর আরো ভালো ফলন হতো যদি তুমি গাছগুলোর নিচের দিকের ডালপালাগুলো ছেটে দিতে এবং গাছগুলোকে যদি লাঠির সঙ্গে বেধে দিতে।

তাই তো!

হের কানালির গাছের টমাটোগুলো কি সুন্দর টসটসে আর বড়। প্রতিটি গাছ উপরের দিকে অনেক বেড়ে উঠেছে। ঠিক করলাম আগামী বছর অবশ্যই তার উপদেশ নিয়ে গাছ লাগাবো।

হের কানালি শুধু বাগান করতেই ওস্তাদ নন, তিনি অনেক রকম হাতের কাজও জানেন। ওনার বাড়ির মেঝের কাঠ এবং মোজাইক নিজের হাতে লাগিয়েছেন। তিনি যেমন হাতের কাজে নিখুত, ওনার স্ত্রী নিনা ঠিক তেমনি বাড়ি ঘর সুন্দর করে রাখা এবং রান্না-বান্নায় পারদর্শী। তিনি যখন রান্না করেন, সারা পাড়া যেন মেতে ওঠে রান্নার সুগন্ধে। তিনি রান্নায় যে সমস্ত হার্ব ব্যবহার করেন তা ওনাদের বাগান থেকেই আসে।

সামার শেষ হয়ে গেল। শীতের শুরুতে আমরা যে যার বাগানের পুরনো শাক-সবজি, লতা-পাতা তুলে ফেলে আগামী সামারের অপেক্ষা করছি। শীতের পাতা ঝরা দিনগুলো আস্তে আস্তে ফুরিয়ে এলো। বসন্তের আগমনী শুনতে পাচ্ছি বিভিন্নজনের বাগানে হরেক রঙের ফুল দেখে। দিনগুলো তখনো বেশ অন্ধকারময়। মানুষের চোখে তখনো সানগ্লাস পরার সময় আসেনি। কিন্তু হের কানালি দেখি চোখে সানগ্লাস পরে ঠাণ্ডা বাগানে চেয়ারে বসে আছেন। তাকে সব সময়েই দেখি কিছু কাজ নিয়ে সদাই ব্যস্ত। ওভাবে বসে থাকতে দেখে কেমন যেন খটকা লাগলো। এর মধ্যে তার সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাগানের অবস্থাও বেশ করুণ। বেশ কয়েকদিন ধরে শুকনো পাতা সাফ না করাতে বাগানটা কেমন যেন এলোমেলো মলিন বেশ ধারণ করেছে।

খটকা শুধু আমার লাগেনি, আরো অনেক প্রতিবেশীর লেগেছে। আমার আরেক প্রতিবেশী পেট্রা-র কাছ থেকে জানতে পারলাম, নিনা কয়েকদিন আগে কাজের জায়গায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। এখন তিনি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে, জ্ঞান নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেল, নিনার মাথায় গলফ বল আকৃতির একটি টিউমার হয়েছে। অবস্থা বেশ খারাপ। অপারেশনের সাফল্য মাত্র পঞ্চাশ ভাগ। টিউমার

এমন জায়গায় হয়েছে যে, তিনি যদি বেচে থাকেন এবং সুস্থ হয়ে ওঠেন তাহলে তাকে আবার নতুন করে কথা বলা শিখতে হবে।

মনে আছে, এর মাত্র কয়েক মাস আগে মিসেস কানালি, মেয়ে ক্লাউডিয়া এবং নাতি ডানিয়েল বেড়াতে গিয়েছিলেন গৃসে। প্লেনে চড়তে হের কানালির প্রচণ্ড ভয়। এই কারণে তিনি সঙ্গে যাননি। বাড়িতেই সময় কাটিয়েছেন বাগানের পরিচর্যা করে।

দুই সপ্তাহ ছুটি কাটিয়ে এবং শরীরকে বেশ ট্যান করে তিনজনে যখন ট্যাকসি থেকে বাড়ির দরজায় নামলো তখন পাশের এক দুষ্ট প্রতিবেশী মার্টিন বেশ জোরেই বলে উঠলেন, এই যা কানালি, গেল তোমার দুই সপ্তাহের শান্তি শেষ হয়ে।

মিসেস কানালির অসুস্থতার আমাদের সবাইকে ভাবিয়ে তুললো। একদিন কাজ থেকে ফিরছি। দেখলাম হের কানালি, ক্লাউডিয়া, নাতি ডানিয়েল গাড়িতে উঠছে।

আমাকে দেখে হের কানালি বললেন, আগামীকাল নিনার অপারেশন। তাই সবাই মিলে হাসপাতালে যাচ্ছি। সেদিন চোখে সানগ্লাস না থাকাতে তার চোখের জল ঢাকতে পারেননি।

নিনার অপারেশন হলো প্রায় বারো ঘণ্টা ধরে। তারপরে তিন দিন বাসার কাউকে দেখিনি। আমরা সবাই চিন্তিত। তিন দিন পরে খবর পেলাম অপারেশন সাকসেসফুল। কিন্তু তখনো জ্ঞান ফিরে আসেনি। নিনার জ্ঞান ফেরে আরো একদিন পরে। একটু ভালো হয়ে ওঠার পর শুরু হয় নিনার কথা বলার থেরাপি ও ট্রেনিং। এর জন্য নিনাকে থাকতে হয়েছে বিভিন্ন স্বাস্থ্য নিবাসে। প্রায় ছয় মাস ধরে বিভিন্ন থেরাপি সেরে নিনা অবশেষে তার ঘরে ফিরে আসেন। এখনো তিনি কথা বলা শিখছেন এবং খুব ধীরে ধীরে কথা বলেছেন।

নিনা আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠছেন আর চোখের সামনে দেখতে থাকলাম হের কানালির জাদুর হাতের ছোয়ায় তার বাগান আবার যেন সবুজ জীবন হয়ে উঠেছে। সামারের মধ্যে এসে দেখলাম, আমার টমাটো গাছগুলো আবার বন্য হয়ে বেড়ে উঠেছে। গতবারের মতো এবং কানালির টমাটো আগের মতোই ডাসা ডাসা সুন্দর ও বড়। *জিতো রহো নিনা, জিতে রহো হের কানালি*। তোমার কাছ থেকে আগামীবারে সামারে অবশ্যই বাগান করার শিক্ষা নেবো।

ফ্র্যাংকফুর্ট, জার্মানি থেকে
nowroz-banu@yahoo.com

তুষার ঢাকা রজনী

- মোহাম্মদ সরওয়ার

জানতাম সমস্যা হবে! কিন্তু সেটা যে এতো প্রকট হয়ে আমার স্মৃতিপটে চিরদিনের জন্য স্থায়ী আসন করে নেবে তা ধারণাও করিনি। এখন এই লন্ডনে উইন্টার, স্নো আর বৃষ্টির সিজন। তাই অন্যান্য দিনের মতো আজও ইন্টারনেটে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখেই বাসা থেকে বের হয়েছি। আজ স্নো পড়ার কথা।

না, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। বৃষ্টির চেয়ে স্নো বরং অনেক ভালো। তাছাড়া অন্যদের কাছ থেকে শুনে স্নো দেখার যে আকাঙ্ক্ষা জন্মেছে, এ দেশে দুই বছরেরও বেশি কেটে যাওয়া সত্ত্বেও এখনো সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পায়নি। গত দুই বছরে দুই একবার যা-ও স্নো পড়েছিল তা এতো অল্প পরিমাণে যে, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করে বরং তাকে করেছে আরো তীব্র।

স্নোর সঙ্গে সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে বলে ছাতাটা সঙ্গে নিলাম। ছাতা! এটা সেই জিনিস যা সঙ্গে বহন না করার অপরাধে দেশে থাকতে সেই ছোটবেলা থেকে বড়বেলা পর্যন্ত কতো সহস্রবার যে বাবার বকুনি খেয়েছি

তার কোনো পরিসংখ্যান নেই। এমনো অনেকবার হয়েছে, হালকা বৃষ্টির মধ্যে বাসা থেকে বের হওয়ার সময় বকুনির ভয়ে হাতে করে ছাতাটা নিয়েছি ঠিকই কিন্তু বাসার অন্য দিক দিয়ে রাস্তার পাশে আমার রুমের যে জানালা তা দিয়ে টুপ করে রেখে চলে গেছি। বেশি বৃষ্টির সময় না হয় ছাতাকে সহ্য করা যায়, আপনারই বলুন রোদের সময়ও কি কারো ছাতার মতো এই বাড়তি ঝামেলা বইতে ইচ্ছা করে? অথচ বৃষ্টির সময় তো বটেই। রোদ বেশি থাকলেও আব্বা ছাতাটা হাতে ধরিয়ে দিতেন এবং আমি চান্স মতো সেটা রেখে চলে যেতাম। আর আজ! বৃষ্টির সময় আমাকে কেউ বলে দিতে হয় না ছাতা সঙ্গে নেয়ার কথা। নিজেই নিই। বৃষ্টি হলে তো নিই-ই। ওয়েদার ফোরকাস্টে বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও নিই। সময়, পরিবেশ এবং অবস্থান মানুষের জীবনকে যেমন প্রবলভাবে প্রভাবিত করে তেমনি তার স্বভাব, রুচি পছন্দ-অপছন্দকেও করে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত! এই আমিই তার বড় প্রমাণ।

আজ আমার সেকেন্ড জব-এ কাজের শেডিউল ছিল না। চার্টার্ড একাউন্টেন্টস ফার্ম *আহমেদ অ্যান্ড কম্পানি*-তে জয়েন করার আগে এ সেকেন্ড জবই ছিল আমার মেইন জব। কিন্তু একাউন্টেন্সি ফার্মে ফুলটাইম জয়েন করা সত্ত্বেও আমার আগেকার এই জবের ম্যানেজার মার্ক ল্যাংফোর্ড-এর রিকোয়েস্টে এটাতে পার্টটাইম করতে থাকি। তাছাড়া টোকিওর পরেই বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যয়বহুল শহর লন্ডন বলে কথা! তার উপর রয়েছে দেশে বাবা-মা, ভাই-বোন, ভাগ্নে-ভাগ্নির প্রতি এক অব্যক্ত, অসম্ভব অবারিত-অবিচল-অদৃশ্য পিছুটান।

মার্ক আমাকে খুব পছন্দ করেন আবার আমিও তাকে। আমার কাজের শেডিউলও মার্ক ফ্লেক্সিবল করে দিয়েছেন। আমার ইচ্ছা অনুযায়ী বেশির ভাগ সময় কাজের শেডিউল দেন তিনি। কিন্তু আজ ব্যতিক্রম। চল্লিশউর্ধ মার্ক আজ বিয়ে করবেন। তাই আমার কাজ না থাকা সত্ত্বেও আমাকে রিকোয়েস্ট করেন তার বদলে কাজ করতে। এ দেশে আমরা ম্যানেজার, সহকারী সবাই এক সঙ্গে কাজ করি। বসের সাবোর্ডিনেট হিসেবে নয়, বরং টিমওয়ার্কের পার্টনার হিসেবে।

আমার প্রায় সব রিকোয়েস্ট-ই মার্ক রাখেন। যখন ছুটি চাই বা যে সময় কাজ করতে চাই অথবা যদি হলিডে (উইথ পে) চাই সবক্ষেত্রেই তাকে দেখেছি আমার সুবিধা-অসুবিধাকে প্রাধান্য দিতে। সুতরাং তার রিকোয়েস্ট আমি রাখবো না, তা হতেই পারে না।

বাহ্যিক ব্যবহারে মধু বর্ষিত হলেও ইংরেজ জাতি স্বভাবগত ভাবে রেসিস্ট (Racist) বা জাত্যাভিমানী। এদের জাত্যাভিমান এই পর্যায়ে যে, একই দেশের হওয়া সত্ত্বেও নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের অধিবাসীরা শুধু ইংলিশ নয় বলে এদের অবজ্ঞা থেকে তারাও মুক্ত নয়। কিন্তু এই লোকটির মধ্যে রেসিজমের প্রভাবটা প্রকটভাবে দেখিনি। কাজের সময়ে নামাজের সময় হলেও অনেক সময় তিনিই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন সমাজের কথা। অথচ ধর্মভীরু একজন কৃশ্চিয়ান তিনি।

তবে কি কাজের প্রতি আমার কমিটমেন্টই আমার প্রতি তাকে দুর্বল করে তুলেছে? হতেও পারে। দেশে থাকতে আজীবন শুনতাম জব পাওয়া কঠিন, অথচ আমার ক্ষেত্রে ছিল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো। আমার জন্য সব সময় জব ছাড়াটাই ছিল কঠিন। যাক সে কথা।

আজ ৩০ জানুয়ারি ২০০৩, বৃহস্পতিবার। একাউন্টেন্সি ফার্মের অফিস শেষে রওনা দিলাম টিউব (Tube)-এ টিউবে (পাতাল রেল বা আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন) মিনিট দশেক দূরত্বে আমার সেকেন্ড জবে। বিকেলের দিকের হালকা তুষারপাতের ফলে রাস্তাঘাটে অল্প অল্প বরফ জমে আছে। পেজা তুলার মতো নরম তুষারের ওপর দিয়ে হাটতে মন্দ লাগছে না। *হ্যারো অন দি হিল* টিউব স্টেশন আমার অফিস থেকে পাচ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত। একটা ট্রেনে চেপে বসলাম। দশ মিনিট দূরের ওয়েম্বলি পার্ক স্টেশন যেখানে বিশ্ববিখ্যাত ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম আমার গন্তব্য।

বসে আছি বেশ কিছুক্ষণ হলো। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার নামটি নেই। ড্রাইভার বার বার ক্ষমা চেয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন। অনুমতি পেলেই রওনা দেবেন। তবে তিনি শিওর না ট্রেন কতো দূর যেতে পারবে। কারণ তুষারপাতের ফলে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনের মাটির ওপরের অংশগুলোর রেললাইন তুষারে অনেকটা ঢেকে গেছে! অপেক্ষায় বসে আছি। ধীর লয়ে ট্রেন চলা শুরু করলো। ১০ মিনিটের পথ অতিক্রম করলো আধা ঘণ্টায়। তবুও তো আসতে পারলাম আমার কাজে, এই অনেক! মার্ককে কথা দিয়েছি তার বদলে আজ কাজ করবো। কথা না রাখাটা ইংরেজ জাতির কাছে ভীষণ অপছন্দ।

আট ঘণ্টা অফিস শেষে তুষারের কারণে দেরিতে এসে পাচ ঘণ্টার স্থলে চার ঘণ্টা কাজ করলাম আজ ASDA (আসদা) নামের সুপারস্টোরে। সুবিশাল শপিং সেন্টারের ভেতর থেকে তেমন কিছু বোঝার উপায় নেই বাইরে কি ঘটছে যতোক্ষণ না বাইরে আসি। তবে আজ কিছুটা বুঝতে পেরেছি। কেননা কাস্টমাররা শপিং শেষে বাড়ি ফেরার পথে যতো কেঅজ (Chaos) আর তার ফলে স্টোরের প্যাসেজে ভীষণ জটলা।

পরিস্থিতি বোঝার জন্য বাইরে এলাম। কিন্তু আমার তুষারের প্রতি ভালোবাসা পূর্ণ মন তুষারের অবস্থা দেখে খুশি হতে পারলো না। চারদিক ঢেকে আছে পুরু তুষারে! হালকা ভাবনা মনে উকি দিল। বাসায় যাবো কিভাবে এই মধ্য রাতে? যেখানে টিউবে করেও বাড়ি ফিরতে লাগে এক ঘণ্টা। আজ অবধারিতভাবে টিউব বন্ধ পাবো। তাহলে কি বাস? অসম্ভব! লন্ডনে সবচেয়ে অপছন্দ করি অ্যাবোভ গ্রাউন্ডের বাস জার্নি। টিউবে যেখানে যেতে লাগে এক ঘণ্টা সেখানে বাসে লাগবে কম করে হলেও তিন ঘণ্টা। তিনশ ত্রিশটা সিগনালের কারণে। তাছাড়া আজ এই তুষার রজনীতে বাস? তা তো নিশ্চয়ই টিউবের আগেই বন্ধ হয়ে গেছে।

নিজের একটা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট নিজেকে সব সময় প্রশান্তি দেয়। তা হলো কোনো কিছুতে বিচলিত না হওয়া। তেত্রিশ বছরের জীবনের কতোবার যে কতো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি ব্যক্তি জীবনে, চাকরি জীবনে, বন্ধু জীবনে! কিন্তু সব কিছুতেই আমি নরমাল। আমার বিশ্বাস, সমস্যা দিয়েছে আল্লাহ, সমাধানও সেই দেবে। শুধু চেষ্টা করে যাবো তার ওপর ভরসা রেখে। এই যেমন আজকের সমস্যার সমাধানও আমার কাছে আছে। বাসায় যেতে পারবো না! নো প্রবলেম। স্টোরের অফিসের সোফায় বসে রাত কাটিয়ে দেবো। কাল ট্রান্সপোর্ট চলা শুরু করলে অফিসে চলে যাবো। ভেরি সিম্পল।

মধ্য রাতে কাজ শেষ করে ভাবলাম, চেষ্টা করে দেখি বাসায় যাওয়া যায় কি না। ওয়েম্বলি পার্ক স্টেশনে এসে শুনলাম সেই সন্ধ্যাতেই সব ট্রেন বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বুঝলাম বাসের জন্য অপেক্ষা করা হবে আরো বড় অপরাধ। বাকি রইলো ট্যাকসি। দীর্ঘ আধ ঘণ্টার অপেক্ষায় দেখলাম একটি মাত্র ট্যাকসি লাইট অফ করে চলে যাচ্ছে সাবধানে দ্রুত। থামানোর চেষ্টা করলাম। বৃথা। বুঝলাম ক্যাবড্রাইভার কোনো মতে বাড়ি পৌছে নিজেকে উষ্ণ করাকে এই মুহূর্তে তার জীবনের একমাত্র কাজ মনে করছে।

একবার ভাবলাম আসদায় ফিরে গিয়ে সোফায় বসে থেকে কোনো মতে রাতটা কাটিয়ে দিই। কিন্তু পরক্ষণেই আমার চিন্তা অন্যদিকে মোড় নিল। কাল সকালে যেহেতু সাড়ে নয়টার মধ্যে অফিসে যেতে হবে সেহেতু কষ্ট করে এখন চলে যাওয়াটাই বেস্ট।

আন্ডারগ্রাউন্ড কাস্টমার সার্ভিস অ্যাসিসটান্টকে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, হ্যারো অন দি হিল নরমাল সময়ে হেটে যেতে আধ ঘণ্টা থেকে পৌনে এক ঘণ্টা লাগে। কিন্তু এখন একটু বেশি লাগবে তুষারের কারণে।

রওনা দিলাম আমার অফিসের দিকে। কিছু দূর এসেই বুঝলাম জীবনের এক কঠিন তুষার রজনী পার করতে যাচ্ছি। দীর্ঘক্ষণ একাই হাটলাম আর মনে মনে ভয় পাচ্ছিলাম কোনো খারাপ কালো মানুষের মুখোমুখি হই কি না! লন্ডনে আমার শুধু একটি বিষয়েই ভয় আছে। তা হলো খারাপ কালো যুবক ও বালক।

কাজ শেষে গভীর রাতে বাসায় ফিরতে গিয়ে আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও কঠিন সতর্ক থাকে আশপাশে কোনো ব্ল্যাক ইয়ব বা কালো যুবকের অবস্থান সম্পর্কে। চারবার বিপদে পড়ে এবং আরো তিনবার স্কেপ করে এখন কালো যুবকদের দেখলেই আমার হাইজ্যাকার মনে হয়। বিধাতা আমায় ক্ষমা করো।

যাহোক, সৌভাগ্যক্রমে এমন কোনো স্টুপিডের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। মনে মনে খুজছিলাম হ্যারো টাউনগামী কোনো পুলিশের গাড়ি। লন্ডনের পুলিশ আমার কাছে বিশ্বাসের আর ভরসার আরেক নাম। কিন্তু না, কোনো পুলিশের গাড়িও চোখে পড়লো না।

প্রায় আধঘণ্টা ছয় সাত ইঞ্চি তুষারের ওপর দিয়ে হাটার পর একটি এলাকায় কিছু দোকানপাট ও মানুষ দৃষ্টিগোচর হলো। মনে একটু সাহস সঞ্চিত হলো। ভেতরে প্যাসেঞ্জার বোঝাই একটি বাসকেও দাড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

বাসটির হ্যারোগামী সাইন দেখে বাসে উঠতেই কয়েকজন যাত্রী হেসে উঠলেন। এটি হ্যারো যাবে কি না জানতে চাইলে তারা একযোগে জবাব দিলেন, *উই উইশ সো*।

বুঝলাম তাদের হাসির কারণ যখন চোখ পড়লো ড্রাইভিং সিটের দিকে। শূন্য!

যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম ড্রাইভার কিছু না বলে বাস থেকে নেমে গেছে অনেকক্ষণ আগে।

মিনিট বিশেক পর ড্রাইভার এসে সবাইকে নেমে যেতে বললো। এখন রাত একটা। প্যাসেঞ্জারদের সকরুণ মিনতিতেও ড্রাইভারের করার কিছুই ছিল না। বরফ জমা রাস্তা এতো পিচ্ছিল ছিল যে, কোনো বড় দুর্ঘটনা ঘটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। অগত্যা সবাই নেমে গেলাম। বাইরে জড়ো হওয়া যাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বললাম, হ্যারো অন দি হিল–এর দিকে কেউ যাবার থাকলে চলুন হাটা ধরি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্বিতীয় কোনো উপায় না থাকাতে আটজনের একটি গ্রুপ তৈরি হলো এবং আমরা হাটা শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর দুজন অন্যদিকে চলে গেল। বাকি রইলাম আমরা চারজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। আমরা গল্প করতে করতে হাটছিলাম এবং কিছুক্ষণ পর পর একেকজন পিছলে পড়ে যাচ্ছিলাম। তাই দুজন করে পরস্পরের হাত ধরে হাটা শুরু করলাম। এতে একজন পিছলে পড়লেও অন্যের সহায়তায় কিছুটা রক্ষা পাচ্ছিল। ক্ষণিকের পরিচয় সত্ত্বেও সবাই যেন কতো চেনা, কতো আপন!

মাইনাস পাচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা বাতাসের প্রকোপে আরো বেশি শীতল অনুভূত হচ্ছিল। হাতের আঙুলগুলো এতোক্ষণে প্রায় অনুভূতিহীন। আমরা হেটে চলেছি। তুষার ঢাকা রজনীর মধ্য রাতের এই অনাকাঙ্ক্ষিত পথ চলার যেন নেই কোনো শেষ। চলছি তো চলছিই। এবং মাঝে মধ্যে টুপটাপ করে পড়ে যাচ্ছি পিছলে। এরই মধ্যে আবারও শুরু হলো তুষারময় ঝড়ো হাওয়া। সেই সঙ্গে হালকা বৃষ্টি। না এই প্রচণ্ড বাতাসে উইন্টারের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছাতা কোনো কাজে আসবে না। কোনো কোনো স্থান এতোই পিচ্ছিল ও জমা বরফে খাড়া হয়ে আছে যে, পিছলে পড়লে গড়িয়ে অনেক দূর চলে যাবার সম্ভাবনা। সেই সঙ্গে আছে হাত পা ভাঙার ভয়! তাই ভীষণ সাবধানে এগোচ্ছি সবাই।

বিভিন্ন বাড়ির সামনে দেখলাম আইসম্যান তৈরি করে রেখেছে দুষ্টু ছেলেরা। তুষার দিনে এ দেশের ছেলেমেয়েদের আনন্দ উপভোগের একটি দিক হলো স্নো দিয়ে মূর্তি তৈরি করা। এছাড়াও রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে পড়ে থাকতে দেখলাম তুষারে ঢাকা দামি সব কার, মার্সেডিজ, বিএমডাবলিউ। স্নোর অবস্থা ও পরিমাণের কাছে এরা অসহায়, পরাজিত। চালাতে না পেরে এগুলোকে পথে রেখেই মালিকরা নিশ্চয়ই হেটে বাড়ি ফিরে এখন গা গরম করছেন। কোনো কোনো কারের পেছনের লাইটের গ্লাস ভাঙা। বোঝা যায় এ ছিল পিচ্ছিল পথে চলতে গিয়ে পিছলে যাওয়া নিয়ন্ত্রণহীন পিছনের গাড়িটির কাজ!

তবে তুষার রজনীর সৌন্দর্যও ছিল অস্বাভাবিক। শ্বেত শুভ্রতায় উদ্ভাসিত যেন পবিত্র স্বর্গীয় কোনো অনুভূতির ছোয়া। যাই হোক। সৌন্দর্য, ঝুকি আর নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের এ পথ চলা শেষ হলো প্রায় দেড় ঘণ্টা পর।

চলতে চলতে রাত আড়াইটার দিকে আমার অফিসের কাছে পৌছালাম। সঙ্গীদেরকে শুভ রাত্রি জানিয়ে অফিস বিল্ডিংয়ে ঢুকলাম। মনে কি এক অনাবিল প্রশান্তি তার বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। এখনই এক কাপ গরম চা খেয়ে একটু রেস্ট নিয়ে এশার নামাজটা পড়েই ঘুমিয়ে থাকবো।

কিন্তু অফিস বিল্ডিংয়ে ঢুকে গ্রাউন্ড ফ্লোরের কার পার্কের দিকে চোখ পড়তেই আমার ভিমরি খাবার যোগাড়। একটা কার! হ্যা, এতো ভাইয়ারই মার্সেডিজ বেঞ্জ! তুষারে ঢাকা পড়ে গেলেও আমার চিনতে সামান্য ভুল হয়নি। কারণ গত প্রায় এক বছর ধরে এটিকে দেখছি প্রতিদিন এবং এটিতে করেই প্রতি শুক্রবার ভাইয়ার সঙ্গে জুমার নামাজ পড়তে যাই। তবে এতো রাতে কারটি তো এখানে থাকার কথা নয়! আমার বুঝতে বাকি রইলো না, নিশ্চয়ই ভাইয়া অফিসে বসে বসে কাজ করছেন!

শব্দহীনভাবে দোতলায় উঠে দেখি আমাদের অফিসে আলো জ্বলছে। হ্যা, এ অফিস বিল্ডিংয়ে এ সময়ে একমাত্র ভাইয়ার পক্ষেই সম্ভব কাজ করা। তাছাড়া চার দিন পর তিনি সপরিবারে বাংলাদেশে বেড়াতে যাবেন। তার আগে অনেক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ গোছাতে হবে যেগুলো এখনো শুধু ভাইয়া একা ডিল করেন। এ অফিসের স্বত্বাধিকারী তোফায়েল আহমেদ বহুগুণের অধিকারী একজন মানুষ। কর্মপাগল, সঙ্গীতপ্রিয়, সুগায়ক এবং একই সঙ্গে ভীষণ ধার্মিক এ মানুষটি আমাদেরকে স্নেহ করেন আপন ছোট ভাইয়ের মতো।

আমাদের অফিসের ভেতর না ঢুকে তিন তলার সিড়িতে গিয়ে বসে আছি। অপেক্ষা করছি কখন ভাইয়া বাসায় চলে যান। এই মুহূর্তে চাচ্ছি না আমার সঙ্গে ভাইয়ার আদৌ দেখা হোক! অনেকগুলো কারণ। তিনি যে কাজের পরিকল্পনা আর টার্গেট করেছেন তাতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এই মুহূর্তে আমার একা থাকতে, শুধুই একা থাকতে ইচ্ছা করছে, এমনকি কারো সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছা করছে না। ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হলে অবধারিতভাবে আমাকে তার বাসায় যেতে বাধ্য করবেন। অথচ অফিস বা কাজের পর নিজের বাসা ছাড়া, এমনকি নিজের রুম ছাড়া আমার স্বর্গেও যেতে ইচ্ছা করে না।

তিন তলার সিড়িতে বসে থেকে নিচে ভাইয়ার গাড়ির দিকে চেয়ে আছি কখন এটি চলে যায়। বরফের ওপর দিয়ে আড়াই ঘণ্টা পথ চলায় এখন ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন। এই বদ্ধ সিড়ি এলাকায়ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাসের ছোয়া লাগছে। দেখলাম সিড়ির পাশের একটি জানালা একটু খোলা। লাগানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। আবারও চেষ্টা করলাম। না, পারলাম না। জানালার একটি লকার হুক ভাঙা। মনে হলো এ হলো বিপদের রজনী। জানালার ভাঙা হুক এ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

অফিস রুমে ঢুকে গরম চা আর ফ্রেশ হওয়া এই মুহূর্তে আমার কাছে একেবারেই গৌণ। কেননা এশার নামাজের সময় চলে যাচ্ছিল। ভেবেছিলাম অফিসের চায়ের কেটলিতে পানি গরম করে ওজু করে এশা পড়বো। কিন্তু ভাইয়ার যাওয়ার নামটি নেই। যতোই সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, আমার টেনশন ততোই বাড়ছে নামাজের সময় চলে যাচ্ছে বলে। আবার এই মাইনাস প্রায় তাপমাত্রার ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ওজু করার কথা চিন্তা করতেও ভয় হচ্ছে। কিন্তু কিছু করারও নেই।

অবশেষে তিন তলার বাথরুমে গিয়ে হিমাংকের অনেক নিচের ঠাণ্ডা অনুভূত পানি দিয়ে অজু করে সেখানকার সিড়ির প্যাসেজে নামাজ পড়ে নিলাম। শান্তি! আহ! যেন মাথা থেকে প্রকাণ্ড এক বোঝা নেমে গেল। হিম শীতল রজনীর সমস্ত কষ্টময় অনুভূতিকে ছাড়িয়ে শান্তিময় নিরুদ্বিগ্ন একটা অনুভূতি নিয়ে সিড়িতে বসে আছি ভাইয়ার যাবার অপেক্ষায়।

রাত প্রায় সাড়ে তিনটা। হঠাৎ গাড়ির হেডলাইট জ্বলে উঠলো আর সেই সঙ্গে আমার চিত্ত নেচে উঠলো অনাবিল আনন্দে। ভাইয়া চলে গেছেন। অফিসে ঢুকে সেন্ট্রাল হিটিং বাড়িয়ে দিয়ে গরম কফির সঙ্গে বিস্কিট ও হালকা কিছু খাবার খেয়ে নিলাম। ততোক্ষণে ফজরের নামাজের সময় হয়ে গেছে।

নামাজ পড়ে জায়নামাজেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো টেলিফোনের শব্দে। জেগে দেখি সাড়ে নয়টার বেশি বাজে। তাই ফোন ধরলাম।

অবাক কণ্ঠে ভাইয়ার প্রশ্ন, কি করে এলাম?

এ সময়ে ভাইয়ার ফোন রিসিভড করার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। তাই কয়েক সেকেন্ডের জন্য থমকে গেলাম, কি বলবো! বললাম, আমি তো ভাইয়া আসিনি।

ততোধিক অবাক হয়ে ভাইয়ার প্রশ্ন, আসোনি মানে?

বললাম, আমি তো কাল রাতে বাসায় যেতে পারিনি। ভাইয়ার প্রশ্ন, ওয়েম্বলি পার্ক থেকে অফিসে এসেছো কিভাবে?

বললাম, হেটে।

অফিসে এসেছো কয়টায়?

বললাম, রাত সাড়ে তিনটার দিকে।

ভাইয়া বললেন, আমি তো গত রাত সাড়ে তিনটার কিছুক্ষণ আগ পর্যন্তই অফিসে ছিলাম। তুমি আমাকে ফোন করলেই তো তোমাকে ওয়েম্বলি পার্ক থেকে গাড়িতে নিয়ে আসতে পারতাম।

উত্তরে বললাম, ফোন করলে আপনি গেলে আপনারও তো কষ্ট হতো। যে হারে স্নো পড়েছে! তাছাড়া আমার সমস্যা, কষ্ট, অসুবিধা এগুলো কারো সঙ্গে শেয়ার করি না। মনে মনে বলি, আমি শুধু আমার আনন্দ এবং সুখটাই সবার সঙ্গে শেয়ার করি।

ভাইয়া বললেন, তোমরা আমার ছোট ভাইয়ের মতো না? তোমার উচিত ছিল আমাকে ফোন করা।

বলি, ভাইয়া, আপনি তো ভাইয়া, আপনার জায়গায় গতকাল আমার আব্বা থাকলে আব্বাকেও ফোন করতাম না।

ভাইয়া বোধ হয় আর কোনো কথা খুজে পেলেন না অথবা কিছু বলার আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। শুধু কণ্ঠে একটা অদ্ভুত ভাব এনে বললেন, তুমি একটা অদ্ভুত।

বৃক্সটন, লন্ডন থেকে
saroar@saroar.com

ভালোলাগার তিন দিন

- নেলী আলম

আমার বিয়ের সময় আমার স্বামী মাত্র এক মাসের জন্য দেশে গিয়েছিল। সময় হাতে খুব কম ছিল। বিয়ের পর একবার আমরা ঠিক করেই ফেলেছিলাম, থাক, এখানে আর হানিমুন করবো না। একবারে ক্যালিফোর্নিয়াতে যাবো। যেহেতু আমাদের পাশের স্টেট এবং ওখানে অনেক বিচও আছে, ওখানেই যাবো তাহলে। প্লেনে গেলে মাত্র এক ঘণ্টা সময় লাগে। না হয় হানিমুনটা একটু দেরিতেই হবে। এসব ভেবে দেশে কোথাও যাওয়ার সিদ্ধান্তটা বদলেই ফেলেছি প্রায়।

হঠাৎ আমার স্বামী শেলী বললো, চলো তিন দিনের জন্য হলেও কক্সবাজার যাই। ক্যালিফোর্নিয়া যখন যাবো তখন সেটা হবে সেকেন্ড হানিমুন।

তার প্রস্তাবটা আমার মনে ধরলো। তাছাড়া আগে কখনো কক্সবাজার যাইনি। তাই রাজি হয়ে গেলাম।

শেলীর ইচ্ছে ছিল প্লেনেই আসা-যাওয়াটা সারবে। কিন্তু কোনোভাবেই রাউন্ড ট্রিপ টিকেট পেলাম না। শুধু ওয়ানওয়ে।

তাকে বললাম, এটাই বেশ হবে। যাই প্লেনে, আসবো ট্রেনে, দুই রকম অভিজ্ঞতা হবে।

সে আমার কথাতে রাজি হয়ে গেল।

প্লেনে যাবার টিকেট কেটে, ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে দুটো টিকেটের রিজারভেশন করে বাসায় ফিরলাম।

আসলেই দারুণ এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল নিঃসন্দেহে বলবো, প্লেনের চেয়ে ট্রেনের জার্নি আরো অনেক উপভোগ্য হয়েছিল। ট্রেনে ঢাকা ফেরার পথে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভোগ করেছিলাম তা আজও আমার মনে দাগ কেটে আছে।

আসা-যাওয়া দুদিন, মাঝখানে আমরা তিনটে দিন ছিলাম। সব মিলিয়ে পাচ দিনের সফর। প্রতিদিন মোটেল থেকে আমরা সকালে গিয়ে দুপুর পর্যন্ত সময় বিচে থাকতাম। দুপুরে ফিরে লাঞ্চ করে, একটু রেস্ট নিয়ে পড়ন্ত বিকেলে যেতাম, সন্ধ্যা নেমে এলে আবার মোটেলে ফিরতাম। রোজ দুবার করে যেতাম বিচের ধারে গেলে আর আসতে মন চাইতো না।

খুব কষ্ট লাগতো যখন নিরাপত্তার কারণে পর্যটনের কেউ সাবধান করে দিয়ে বলতো, সন্ধ্যার সময় কেউ কোনো প্রকার অলংকার-ক্যামেরা সঙ্গে রাখবেন না।

অলংকার বাদ দেয়া যায়। কিন্তু এতো সুন্দর প্রাকৃতি সৌন্দর্যের তীরে ক্যামেরা ছাড়া ভাবাই যায় না। অপূর্ব সূর্যাস্তের ছবি তুলতে সবারই মন চাইবে। নিষেধ সত্ত্বেও আল্লাহর উপর ভরসা করে ক্যামেরা ঠিকই সঙ্গে রেখেছিলাম, সূর্যাস্তের সময় অনেক ছবি তুলেছি।

ছবিগুলো অত্যন্ত যত্নে আমার এলবামে সংরক্ষিত আছে। যখনই দেখি তখনই মনটা আজও পনেরো বছর আগের সেই ভালো লাগার মুহূর্তগুলোকে মনে করিয়ে দেয়। মনে হয়, আমার বয়সটাও বোধহয় আজও তাই রয়ে গেছে। বয়স বেড়েছে, ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে, এসব কথা তখন আর মনে থাকে না।

জীবনে আরো অনেক ভালো লাগার দিক আছে। কিন্তু ওই তিনটে দিনের ভালো লাগার কথা, কোনোদিনও মন থেকে মোছার নয়।

এরপর বিদেশে কয়েকবারই বেশ কয়েকটা বিচে গিয়েছি। বসেছি, সময় কাটিয়েছি। সন্ধ্যাও উপভোগ করেছি। কিন্তু আমার দেশের কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের সেই অনুভূতি পাইনি, সেই ভালো লাগার সঙ্গে এই ভালো লাগার অনেক পার্থক্য।

আমেরিকার বিচে অলংকার, ক্যামেরা, আরো মূল্যবান কিছু থাকলে তেমন ভয় নেই। কেউ রাখতেও বারণ করবে না। তারপরও আমার দেশের সমুদ্র সৈকতের মতো প্রশান্তি, আনন্দ আর মুগ্ধতা পাইনি।

কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের দেশের এই বৈশিষ্টময় সমুদ্র সৈকতটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে, ভ্রমণ-বিলাসীদের উপভোগের সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়তে পারে তাহলে আরো অপূর্ব হয়ে উঠবে আমাদের সমুদ্র সৈকতটি।

আজও আমার মনটা মুহূর্তে ছুটে যায় সেই সমুদ্রের পাড়ে। যতোবারই দেশে গেছি, খুব ইচ্ছে হয়েছে যাবার। কিন্তু বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়াতে আর যাওয়া হয় না।

আমার মনে হয়, যারই সুযোগ ও সামর্থ আছে তারই উচিত নিজের দেশের এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অন্তত একটিবার দেখা।

দিনে দিনে আরো বয়স বাড়বে, জীবনটাও একদিন শেষ হয়ে আসবে। কিন্তু আমার সেই তিন দিনের ভালো লাগার সময়টুকু কখনো নিষ্প্রভ হবে না।

আমেরিকা থেকে

অতীতের ইওরোপিয়ান অতিথি

ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে লন্ডনে কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী মিলে একটি জয়েন্ট স্টক কম্পানি খুললেন। উদ্দেশ্য, আফ্রকার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে জলপথে প্রাচ্য দেশে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা। সেই কম্পানিই পরে রূপধারণ করে *ইস্ট ইনডিয়া কম্পানি* নামে।

পরবর্তীকালে ইওরোপিয়ানরা এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন না করলে ইতিহাস কোন দিকে বাক নিতো তা অনুমান করা কঠিন নয়। জল-জঙ্গল সরিয়ে কুঠি স্থাপন, নদীকে ঘিরে ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তন, জনসমাগম, অভূতপূর্ব এক প্রাণচাঞ্চল্য, সবই ঘটে গেছে গত তিন চার শতাব্দী সময়কালে।

এই সময়কালে বিভিন্ন সময়ে ইওরোপিয়ান পর্যটক ও ধর্ম প্রচারকরা বাংলাদেশে এসেছেন, ঘুরেছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। এবং সে অভিজ্ঞতা তারা লিখে গেছেন কাগজের পাতায়। তাদের সেই বর্ণনায় ফুটে উঠেছে তখনকার গ্রামবাংলার জীবন-যাপন ব্যবস্থা তথা তৎকালীন বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা।

এ রকমই একজন পর্যটক রালফ ফিচ Ralph Fitch, ভারত উপমহাদেশে এসেছিলেন ১৫৮৩ সালে। বহু বন্দর নগরী অতিক্রম করে চট্টগ্রাম (তখনকার Porto Grande) শহর থেকে তেতুলিয়া নদী হয়ে বাকোলা (Bacola বা বরিশাল জেলা) শহরে উপস্থিত হন ১৫৮৬ সালে।

তিনি লিখেছেন, ওখানকার রাজা (রাজা কন্দর্পনারায়ণ) বেশ বন্ধু ভাবাপন্ন, বন্য প্রাণী শিকারেই তার খুব আনন্দ। তার দেশ খুবই সুন্দর ও সম্পদশালী, ফুলে-ফলে সুশোভিত। গোলা ভরা ধান, সুতা আর সিল্কের তৈরি কাপড়ের প্রাচুর্য। ঘরগুলো দেখতে সুন্দর, অনেক উচুতে তৈরি, রাস্তাগুলোও বেশ প্রশস্ত। এবং ওই রাস্তা দিয়ে হেটে যাওয়া লোকজনদের কোমরে একটুকরা কাপড় ছাড়া সম্পূর্ণই নগ্ন। মেয়েদের ছিল কিছু অতিরিক্ত, গলায় ও বাহুতে রূপার অলংকার এবং পায়ে রূপা ও হাতির দাতের মল।

ভারত উপমহাদেশে যে চারজন বৃটিশ পর্যটক সর্বপ্রথম বাণিজ্যের প্রয়োজনে ভ্রমণে আসেন রালফ ফিচ তাদেরই একজন। সর্বোপরি একমাত্র তিনিই সফল ভ্রমণের পর আবার লন্ডনে ফিরে যেতে সমর্থ হন। তার সফল ভ্রমণের ওপর ভিত্তি করেই লন্ডনে ১৬০০ সালে ইস্ট ইনডিয়া কম্পানির প্রতিষ্ঠা হয়। এবং রানী এলিজাবেথের দেয়া এক চার্টার-এর দ্বারা এই কম্পানি ভারতবর্ষে একচেটিয়া বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করে।

ইংরেজদের ইনডিয়ায় পর্দাপণের প্রায় এক শতাব্দী আগে পর্তুগিজদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়। পর্তুগাল থেকে ভাস্কো-ডি-গামা সমুদ্রপথে আফৃকা মহাদেশ ঘুরে ইনডিয়ার কালিকাট শহরে এলেন ১৪৯৮ সালে। তিনি নৌকা ভর্তি করে নিয়ে গেলেন বিভিন্ন রকমের মশলা। এবং তা ইওরোপের লিসবন শহরে বিক্রি করলেন সোনার দামে।

সেই থেকে পর্তুগিজরা প্রতি বছরই আসতো মশলার খোজে।

১৫১০ সালে পর্তুগিজরা ইনডিয়ার গোয়া শহর দখল করে নিল, ক্রমে তার বিস্তার ঘটেছিল বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, শ্রীপুর, হুগলি, সপ্তগ্রাম ও বাকোলাসহ আরো অনেক জায়গায়।

ইওরোপে তখন শীতের সময় তাজা মাংসের বা ফ্রেশ মিট-এর বড়ই অভাব। লবণ দিয়েই মাংস সংরক্ষণ করা হতো শীতের সময় খাওয়ার জন্য। কিন্তু তা ছিল নিম্নমানের ও দুর্গন্ধযুক্ত। তাই লিসবনের বাজারে মশলার ছিল দারুণ কদর। মাংস সংরক্ষণের জন্য এর এরোমেটিক সুগন্ধ ও স্বাদ দুইই ছিল আকর্ষণীয়। তবে দাম ছিল সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। ভারতবর্ষ থেকে মালয়শিয়া পর্যন্ত এই ব্যবসায় ছিল পর্তুগিজদের একছত্র আধিপত্য। সমুদ্রপথ, নেভিগেশন, বায়ু প্রবাহ ও সমুদ্র স্রোতের গতি প্রকৃতি সবই ছিল পর্তুগিজদের জানা।

মশলা বস্তুটি আরো সহজলভ্য করার জন্য লন্ডনের কয়েকজন ব্যবসায়ী মিলে সিদ্ধান্ত নিল পর্তুগিজদের অনুসরণ করার। সুগন্ধযুক্ত মশলা আমদানি ছাড়াও লন্ডনের কাপড় ইন্ডাস্ট্রির বাজার তৈরি করাও ছিল ব্যবসায়ী দলটির লক্ষ্য। তারা পর্তুজিদের কাছ থেকে গোপনে বিভিন্নভাবে সমুদ্রপথের সব তথ্য যোগাড় করতে থাকলো। এসব সূত্র ধরে চেষ্টাও করেছিল কয়েকবার ভারতবর্ষে যাওয়ার জন্য।

অবশেষে ছোট একটি দল ১৫৮৩ সালে বিকল্প পথে যাত্রা শুরু করলো, ভূমধ্য সাগর হয়ে ভারতবর্ষে আসার পরিকল্পনা নিয়ে। সম্রাট আকবরকে লেখা রানী এলিজাবেথের একটি চিঠিও তাদের সঙ্গে ছিল। এ দলটিরই একজন সদস্য রালফ ফিচ এবং কেবল তিনিই লন্ডনে ফিরে যেতে সক্ষম হন। তার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই বৃটিশ ইস্ট ইনডিয়া কম্পানির জন্ম। এ কম্পানিই একদিন প্রবল প্রতাপ মোগল সম্রাজ্যকে পরাজিত করে আত্মপ্রকাশ করেছিল ভারতবর্ষের রুলিং পাওয়ার হিসেবে। সে অন্য প্রসঙ্গ।

রালফ ফিচের বর্ণনায় তখনকার বাকোলা বা বর্তমানের বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের তৎকালীন জীবন যাপন, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে। বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৭০ থেকে ১৮৭৫) এইচ. বেভারিজ (H. Beveridge) ওই অঞ্চলের জীবন প্রবাহ সম্পর্কে প্রাণবন্ত রচনা বই আকারে প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, রালফ ফিচ সম্ভবত বাকোলা চন্দ্র দ্বীপের রাজধানী কচুয়ায় এসেছিলেন। সে শহর হয়তো মেঘনার প্রবাহে অনেক আগেই হারিয়ে গেছে।

রালফ ফিচ বাকোলা থেকে ভ্রমণে যান উত্তর দিকে শ্রীপুর শহরে (বিক্রমপুর অঞ্চল)। পদ্মা নদীর তীরে এই শ্রীপুরের রাজা ছিলেন কেদার রায়। রালফ ফিচ লিখেছেন, এটি তখন মোঘল সম্রাজ্যের অধীনে হলেও সবাই ছিল মোঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। মোঘল সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়ে যখন বিদ্রোহীদের তাড়া করতো তখন অসংখ্য নদ–নদীর মধ্যে সহজেই বিদ্রোহীরা লুকিয়ে থাকতে পারতো।

এরপর রালফ ফিচ যান নিম্নবঙ্গের রাজধানী সোনারগাও–এ, যেখানে পৃথিবীর সর্বোকৃষ্ট মসলিন তৈরি হতো। তার ভাষায় ঈসা খা ছিলেন অত্যন্ত বন্ধু ভাবাপন্ন একজন লোক। ওখানকার অনেকেই সম্পদশালী ছিলেন যদিও বেশির ভাগ ঘরবাড়িই ছোট ও নিম্নমানের। এগুলোতে ছিল খড়ের ছাউনি। দরজা–জানালায় ঝুলিয়ে রাখা হতো চটের পর্দা যেন শিয়াল–কুকুর ঢুকতে না পারে।

রালফ ফিচ বাংলাদেশ থেকে পরে মিয়ানমার, মালয়শিয়া ঘুরে আবার লন্ডনে ১৫৯১ সালে ফিরে যেতে সমর্থ হন।

এরপর দুজন পর্তুগিজ ধর্মযাজক ফনসেচা (Fonseca) এবং বোজ (Bowes) তাদের সুন্দরবন ভ্রমণের কথা চিঠিপত্রের মাধ্যমে ১৬০০ সালে ইটালির ভেনিস শহরে প্রকাশ করেন। ল্যাটিন ভাষাসহ ইটালিতে এটি আবার প্রকাশিত হয় ১৬০৩ সালে। জেসুইট মিশনারি নিকোলাস পিমেন্টা (Nicholas Pimenta) তাদের কার্যক্রম বর্ণনা করতে গিয়েই ইনডিয়ার গোয়া থেকে চিঠিগুলো পাঠিয়েছিলেন জেসুইট প্রধান ক্লড অগাভিভা (Claude Aguaviva)-এর কাছে। তিনি চিঠিতে জানান, ফনসেচা ও বোজ নামে দুইজন পাদরি ১৫৯৯ সালে কিভাবে চট্টগ্রাম থেকে চন্ডিকান বা যশোর উপস্থিত হন এবং পথিমধ্যে বাকোলো শহরে যাত্রা বিরতির অভিজ্ঞতা।

বাকোলার রাজা রামচন্দ্র রায় সম্পর্কে ফনসেচা বর্ণনা করেন, বাকোলার রাজা অতি শিশু। তার বয়স আট বছরের বেশি বোধ হয় না। কিন্তু এই বালক রাজা তার বয়সের অপেক্ষাও সুচতুর এবং বুদ্ধিমান।

রাজা আমায় পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন, তারপর হাসিমুখে জানতে চাইলেন, আমি বাকোলা থেকে কোথায় যাবো।

বললাম, এখান থেকে সরাসরি চন্ডিকানে যাবো। সেখানে আপনার ভবিষ্যৎ শ্বশুর মহাশয়ের দরবারে কিছু দিন থাকবো।

ফনসেচার–এ এই বর্ণনায় বোঝা যায়, কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত কন্যা বিন্দুমতির বিয়ের কথা হচ্ছিল।

বাকেরগঞ্জ বরিশাল জেলার কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট বেভারিজ জানিয়েছেন, যশোর জেলা পূর্বে খাঞ্জা আলি (খান জাহান) নামে সুবেদারের দখলে ছিল। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে খাঞ্জা আলির মৃত্যু হয়। এর একশ বিশ বছর পরে যশোর নগর স্থাপন করেন বিক্রমাদিত্য। খাঞ্জা আলির যিনি উত্তরাধিকারী ছিলেন, খুব সম্ভবত তার নাম চাদ খা। বিক্রমাদিত্য, (প্রতাপাদিত্যের বাবা) জমিদারি দখল নেয়ার পরও জমিদারি চাদ খার নামেই অভিহিত হয়। পর্তুগিজ লেখকরা এ চাদ খাকেই চন্ডিকান Chandecan বলে উল্লেখ করেন।

এবার ফনসেচার প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। তিনি বাকোলা শহর থেকে কিভাবে চন্ডিকানে পৌছালেন সে বিষয় লিখেছেন, বাকোলা থেকে চন্ডিকানের পথটুকু এতো প্রাণবন্ত ও মনোরম, এ দৃশ্য জীবনে দেখেছি কি না সন্দেহ। অনেক স্বচ্ছ–সলিল নদ–নদী অতিক্রম করে চলেছি আমরা। নদীর দুই পাশ সবুজ বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত। এক পাশে দেখা যায় হরিণসহ বন্যপ্রাণী ছোটাছুটি করছে, অন্য পাশে গাভীর দল বিচরণ করছে, বানরের দল লাফ দিয়ে এক গাছ থেকে অন্য গাছে যাচ্ছে। অনুকরণপ্রিয় বানরেরা মজা করছে, ভান করছে। ভ্রমণকারীদের জন্য সত্যিই এ এক আনন্দদায়ক ব্যাপার। আমি অতিক্রম করে যাচ্ছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর সম্পদে পরিপূর্ণ এক দেশ।

পলাশির প্রান্তরে স্বাধীনতার সূর্য অস্ত গেল বলে কাব্য, সাহিত্য, নাটকে অনেক হাহাকার হয়েছে। পরবর্তীকালে ইতিহাস এসেছে শ্বেতাঙ্গদের গবেষণা থেকে। তার কিছু বিকৃত, কিছু স্বীকৃত। প্রশ্ন হতে পারে, চারশ বছর আগের কথা জেনে কি লাভ। উত্তর একটাই, নিজেদের গ্লানি আর গৌরব যদি কিছু থেকে থাকে, অতল মহাকালের গর্ভ থেকে তা তুলে আনা। একালের আলোতে সেকালকে দেখে একটু সচেতন হবার সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা।

ফিলাডেলফিয়া, ইউএসএ থেকে
mdshahid@mail.med.upenn.edu

আবদালির তাবুতে

- মাহমুদ আলম খন্দকার মামুন

আবদালি। কুয়েতের উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত ঘেষা একটি শহর। সউদি আরব সীমান্ত সংলগ্ন এই শহরের প্রায় পুরোটাই ধু ধু মরুভূমি। সামারে যেমন এ মরু তাতানো উনুন, শীতে তেমনি অনেকটা আইসবার্গ। তবুও এই শীতে এই আবদালি শহরটি পরিণত হয় একটি প্রমোদ কেন্দ্রে। সারা কুয়েত থেকে কুয়েতিরা এখানে এসে তাবু গেড়ে বসে। প্রায় তিন মাস এরা এখানে তাবুতে বাস করে। টিভি, রেফ্রিজারেটর, স্যাটেলাইট রিসিভার, জেনারেটর, পানির ট্যাংক ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সব কিছুই এরা গাড়ি করে নিয়ে আসে। এরপর এই তিন মাস এসব দেখাশোনা করার জন্য প্রতি তাবুতে একজন অথবা দুজন লোক রাখা হয়।

কাঞ্চন মিয়া এ রকম একটি তাবুতে কাজ করেন। বাংলাদেশে আমাদের বাড়ি একই গ্রামে। বয়সে আমার চেয়ে কিছুটা বড় হলেও আমরা বন্ধুর মতোই।

এক শুক্রবারে এলো কাঞ্চন মিয়ার ফোন। বিস্তারিত জানিয়ে বললো, ঈদটা আমার সঙ্গে কাটিয়ে যা।

দুদিন পরেই ছিল ঈদুল আযহা। তিন দিন পেলাম ঈদের ছুটি। ঈদের আগের দিন বিকেলে গিয়ে পৌছালাম কাঞ্চন মিয়ার তাবুতে। তাবুর চারদিকে খোলা মরুভূমি। যেদিকে দুই চোখ যায় শুধু বালি আর বালি। মাঝে

মধ্যে দুই একটি খেজুর গাছ। আশপাশের দুই তিন কিলোমিটারের মধ্যে কোনো তাবু নেই। চারদিকে সুনশান নীরবতা। শুধু মাঝে মধ্যে শো শো শব্দে বাতাস এসে দ্রুত এদিক-সেদিক চলে যায়।

পাশাপাশি তিনটি তাবু। মাঝের বড় তাবুটিতে কাঞ্চন মিয়ার কুয়েতি তার পরিবার নিয়ে থাকেন। পাশের একটি অতিথিদের জন্য, অন্যটিতে থাকে কাঞ্চন মিয়া।

আমাকে পেয়ে কাঞ্চন খুশিতে আটখানা। একেবারে জড়িয়ে ধরলো। জানা গেল তার কুয়েতি মালিক ঈদ উপলক্ষে কুয়েত সিটিতে নিজ বাড়িতে চলে গেছে। ঈদের পরের দিন আসবে।

রাতে খাবার পর সে বললো, কোরবানির জন্য একটি বাছাই করা দুম্বা রাখা আছে। প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণও আছে। শুধু খুব ভোরে উঠতে হবে।

কাঞ্চনই খুব ভোরে আমাকে জাগিয়ে দিল। সমস্যা দেখা দিল ঈদের নামাজ পড়া নিয়ে। কারণ এখানকার নিয়ম হচ্ছে, ফজরের নামাজের পরেই ঈদের নামাজ পড়া। তাছাড়া তাবু খালি ফেলে রেখে দূরে কোথাও যে নামাজ পড়তে যাবো সেটাও সম্ভব ছিল না। অগত্যা আমরা দুজন মিলেই তাবুর পাশে খোলা জায়গায় একটি খেজুর গাছের পাশে ঈদের নামাজ পড়লাম।

নামাজের পরেই দুজনে মিলে দুম্বাটিকে ধরে কোরবানি করা হলো। এখানকার স্থানীয় আরবি ভাষায় দুম্বাকে বলা হয় *গানাম*।

কাঞ্চন মিয়া একাই খুব দক্ষ হাতে দ্রুত গানামের চামড়া ছিলে কাটা-কুটি করতে লাগলো।

আমি এদিকে চুলা ও মশলার আয়োজন করতে লাগলাম।

দুপুরের আগেই আমাদের রান্না পর্ব শেষ হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে নিলাম।

বিকেলে তাবুর পাশেই ঘুরতে বের হলাম। তাবুর পেছনে একটু দূরে একটি উচু বালিয়াড়িতে নিয়ে গেল কাঞ্চন মিয়া। বালিয়াড়ির ওপর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। জনমানুষের কোনো চিহ্ন নেই। দূরে, বহু দূরে দুই একটি তাবু চোখে পড়ে।

শীতের হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আমরা তাবুতে ফিরে এলাম।

রাতে খাবার পর আমরা গল্প করছি। এমন সময় গাড়ির হর্নের আওয়াজ হলো। কাঞ্চন ও আমি বাইরে এসে দেখি এক অ্যারাবিয়ান যুবক ও যুবতী গাড়ি থেকে নামছে। যুবতীর আপাদমস্তক কালো বোরখায় ঢাকা। তারা গিয়ে বড় তাবুটায় ঢুকলো।

কাঞ্চন বললো, তুই ভেতরে যা, আমি একটু পরেই আসছি।

কিছুক্ষণ পরেই কাঞ্চন এসে বললো, এটা হচ্ছে আমার মালিক কুয়েতির বড় ছেলে। তার সঙ্গে যে মেয়েটিকে দেখেছিস ওটা হচ্ছে এক লেবানিজ মেয়ে। কুয়েতির একটি বড় ফার্মে সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করে। এর আগেও এরা দুই একবার এখানে এসেছিল। বলেই কাঞ্চন মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

বললাম, কিন্তু এ ঈদের রাতেই বা এরা এখানে কি করবে?

একটু পরেই টের পাবি। শোন, এখানে যতোগুলো তাবু দেখছিস, অধিকাংশ তাবুতেই প্রতিনিয়ত চলছে এ প্রমোদ খেলা। এটা এদের জন্য কোনো ব্যাপারই না, খুবই সাধারণ। বলেই কাঞ্চন বললো, বের হয়ে আয়, একটা অভিজ্ঞতা অর্জন কর। বলেই কাঞ্চন আমাকে বড় তাবুটির পেছনে নিয়ে গেল। ফিশ ফিশ করে বললো, এই যে ছিদ্রগুলো দেখতে পাচ্ছিস, এর কোনো একটিতে চোখ রাখ। আমি কায়দা করে আগেই এ ছিদ্রগুলো করে রেখেছিলাম।

ছিদ্রের মধ্যে চোখ রেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বসে আছে একটি পরী! কোনো মেয়ে এতো সুন্দরী হতে পারে তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। তার স্তন জোড়া ছিল ধবধবে ফর্শা ও খাড়া। মাঝারি উচ্চতায় সুঠাম দেহের এই মেয়ের ঝকঝকে কালো চুলগুলো কোমর পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। লেবানিজ

মেয়েদের চুল সাধারণত ইওরোপিয়ানদের মতো কিছুটা সোনালি রঙের হয়। কিন্তু এ মেয়েটির চুল একেবারেই ঝকঝকে কালো, কিছুটা কোকড়ানো।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, কুয়েতি যুবকটি সম্পূর্ণ নগ্ন ছিল না। তার নিম্নাঙ্গে আন্ডারওয়্যার ছিল। সেও পেশি বহুল সুঠাম দেহী। প্রথমে সে মেয়েটিকে পাজাকোলা করে তুলে নিয়ে কার্পেটে শুইয়ে দিল। তারপর মেয়েটির কপালে আলতো করে চুমু খেয়ে দুজনে জড়াজড়ি করে কার্পেটে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। তারা আদিম খেলার চূড়ান্ত পর্বে ঢোকার জন্য প্রস্তুতি নিল।

এ পর্যায়ে আমার মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। ছিদ্র থেকে চোখ সরিয়ে কাঞ্চনকে বললাম, আমি আর দাড়াতে পারছি না। একদিনের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। চল তাবুতে যাই।

কাঞ্চন আমাকে ধমক দিয়ে বললো, এ পর্যায়ে কেউ চলে যেতে চায়, বেকুব, সবটা দেখ।

অগত্যা আমার পীড়াপীড়িতে সে তাবুতে যেতে বাধ্য হলো। সারা রাত আর আমার ঘুম হলো না। মাঝে মধ্যেই পাশের তাবু থেকে বিচিত্র সব শব্দ হতে থাকলো।

পরদিন সকালে এক অন্য রকম ঈদের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলাম আমার কর্মস্থলে।

কুয়েত থেকে

বোধ

তাছলিমা সিদ্দিকা

মাঝে মধ্যে একেকটা দিন একেকটা ক্ষণকে খুব নিজের করে পেতে ইচ্ছা করে। মনে হয় কোনো একটা নির্ঘুম জ্যোৎস্না রাত অথবা কল্পনার জাল বোনা একটা সোনালি সকাল হবে শুধুই আমার।

এসব দিনে কর্তব্যের দাসত্ব করবো না একদম। ঘড়ির এলার্ম শুনেই আমাকে জাগতে হবে না। জেগেই কাউকে সময় মতো অফিস ধরানোর জন্য ছুটোছুটি করতে হবে না।

ইদানীং মনে হয় আমি বুঝি আমার নই – আমার মন, আমার শরীর, সৌন্দর্য, বোধ–বুদ্ধি সব বুঝি অন্যের। নিজের বলতে আমার বুঝি কিছু নেই। আমি বুঝি দায়িত্ব আর কর্তব্যের শৃঙ্খলে বন্দী।

সকালে ঘুম ভাঙতেই এসব ভাবনাগুলো আমাকে আমার নিজের সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। তারপর সারা দিনের ব্যস্ততায় জীবনের প্রয়োজনে এসব ভাবনাগুলো চাপা পড়ে যায়। সন্ধ্যায় কর্তাটি অফিস থেকে ফিরতেই নিজেকে আর নিজের মনে হয় না, তখন একেবারেই অন্যের হয়ে যাই।

জানি না, বাংলাদেশের অন্য দশটা শিক্ষিত গৃহিণী আমার মতো এমন করে ভাবে কি না!

আমার মতো তাদের কি কখনো মনে হয় না যে অসুস্থ হলে তার স্বামী তার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে অথবা কোনো একদিন স্বামী তাকে পাশে বসিয়ে যত্ন করে তুলে খাওয়াবে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, আমি ভোজন রসিক নই। বরং আমাকে স্বল্প আহারি বলা যায়।

অবশ্য যাদের সন্তান আছে তাদের ভাবনায় এসব চাওয়া–পাওয়া বা ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলো স্থান পায় কি না আমার জানা নেই।

আমার এই লেখা পড়ে কেউ যদি ভেবে থাকেন, আমাদের স্বামী–স্ত্রী দুজনের মধ্যে বনিবনা বা ভাব–ভালোবাসা নেই সেটা একেবারে ভুল। ভদ্রলোক আমাকে ভালোবাসেন, বেশ ভালোবাসেন। আমাকে ছাড়া তার পৃথিবী অন্ধকার। অবশ্য আমিও তাকে কম ভালোবাসি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, কাউকে ভালোবাসলে তার ইচ্ছা–অনিচ্ছাগুলোকেও ভালোবাসতে হয়।

আজ হঠাৎ লেখার মাধ্যমে আমার এই কথাগুলো প্রকাশ করতে পারছি বলে ভালো লাগছে। গত কয়েক সংখ্যা ধরে যাযাদি *ঈদ* সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান করেছে। সেটা দেখে আগামী ঈদের কথা মনে পড়ে গেল। আর ভীষণ ইচ্ছা করলো বাবা-মায়ের সঙ্গে এবারের ঈদটা উদযাপন করতে। কিন্তু এই ইচ্ছার কথা কখনোই আমার কর্তাটিকে বলতে পারবো না। কারণ এই ইচ্ছাটি পূরণ করতে হলে আমাকে তার ইচ্ছার ওপর আমার ইচ্ছাটাকে চাপিয়ে দিতে হবে। যেটা কখনোই করি না।

তার ধারণা মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলেই তাদের বাবা-মা বা ভাই-বোনদের প্রতি সব ভালোবাসা ফুরিয়ে যায়। এই যে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঈদ করতে যাওয়া বা একেকটা দিন নিজের করে পাবার মতো সামান্য চাওয়াগুলো নিয়ে যদি সংসারের কর্তাব্যক্তিরা একটু সচেতন হতেন কিংবা গৃহিণীদের চাওয়া-পাওয়ার বিষয়ে তাদের যদি একটু বোধোদয় হতো তবে পৃথিবীটা নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর হতো।

পল্লবী, ঢাকা থেকে

স্বর্ণকার

- মোহাম্মদ জহিরুল হক আখন্দ

একজন স্বর্ণকার যে তার *মায়ের কানের সোনাও চুরি করে* এ কথাটি প্রথম যখন শুনেছি তখন কিন্তু এর অর্থ পুরোপুরি বোঝার বয়স হয়নি। এর অর্থ বোঝার কাছাকাছি বয়সে যখন পৌছেছি তখন থেকে কোনো স্বর্ণকারের প্রতিই আমার আস্থা ছিল না।

আমি তখন কর্ম জীবনে যশোরে।

এক শ্রাবণের বিকেলে যশোরের দড়াটানায় বাজার করতে গিয়ে বৃষ্টির কারণে জনৈক গোপাল স্বর্ণকারের দোকানে আটকা পড়েছি। গোপালদা তখন তার এক বন্ধুর সঙ্গে খোশগল্পরত। গোপালদা বার বার আমায় বসতে বলার পরও না বসে দাড়িয়ে শ্রাবণের আকাশ, মেঘপুঞ্জের ভেসে বেড়ানোর খেলা দেখে চলেছি।

এক সময় গোপালদার বন্ধুটি বললেন, জানো গোপালদা, গতকাল একটা মজার ঘটনা ঘটেছে।

কি ঘটনা?

বন্ধুটি বললেন, কয়েকজন লোক ইনডিয়া হয়ে পাকিস্তান যাওয়ার জন্য এক দালালের সঙ্গে চুক্তিপত্র করে এবং চুক্তি মতো দালালকে তার পাওনা টাকা পরিশোধও করে। দালাল তাদেরকে সীমানা পার করার জন্য বেনাপোলের নিকটবর্তী এক গ্রামে নিয়ে অদূরের একটা বাড়ি দেখিয়ে বললো, তোমাদের সঙ্গের টাকা-পয়সা, মালামাল সব আমার কাছে জমা দাও এবং এক দৌড়ে ওই যে বাড়িটা সে বাড়িতে পৌছে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

দালালের কাছে সব কিছু জমা রেখে তারা রাতের অন্ধকারে দৌড়ে ওই বাড়িতে পৌছে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও দালালের সাক্ষাৎ না পেয়ে পরে বুঝতে পারে যে, তারা দালাল কর্তৃক প্রতারিত হয়েছে।

ঘটনাটি শোনার পর গোপালদা অবশেষে বললেন, এতো বড় পাপ কি ভগবান সইবে!

আমি যে এতোক্ষণ তাদের পুরো গল্পটা মন দিয়ে শুনেছি তা হয়তো তারা জানে না। এরই মধ্যে গোপালদাকে লক্ষ্য করে বললাম, দাদা, আমি কি আপনাদের জন্যে দুই কাপ চা আনবো।

গোপালদা আপত্তির সঙ্গে বললেন, না দাদা, তা হয় না, আমার দোকানে বসে আপনি চা আনাবেন কেন?

বললাম, জানেন গোপালদা, জীবনের এতোটা পথ ভগবানকে যে চেনে এমন একটা লোক হন্যে হয়ে খুজেছি। কিন্তু পাইনি। আজ মনে হয় সে লোক পেয়ে গেছি। তাই সৃষ্টি সুখের উল্লাসের মতো পেয়ে যাওয়ার উল্লাসে আমার নাচতে ইচ্ছা করছে।

আমার প্রশংসার জবাবে গোপালদা বললেন, দেখুন না, বেটা দালাল কতো বড় জালিয়াতিটা করলো! এতো বড় পাপ ভগবান সইলে সৃষ্টি টিকবে কি করে? তাহলে সৃষ্টি যে অনাসৃষ্টিতে ভরে যাবে।

গোপালদার কথার রেশ ধরে বললাম, জানেন গোপালদা, এ জীবনে কোনো স্বর্ণকারের ওপরই আমার আস্থা ছিল না। আজ আপনাকে দেখে, আপনার কথা শুনে এখন ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনাকে দিয়ে আমার স্ত্রীর জন্যে এক জোড়া দুল বানাবো।

গোপালদা আবারও চা আনালেন এবং চায়ের কাপটি আমার প্রতি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ব্যতিক্রম বলে কিছু না থাকলে এতো বড় বিশ্ব কিসে দাড়িয়ে আছে!

সে রাতে পুরো ঘটনাটা স্ত্রীকে বললাম। এতো বলার পরও তার জন্যে দুল বানাতে দিয়েছি তা সে বিশ্বাস করেনি। কারণ আমার মতো আস্থাহীনের এটুকুতেই আস্থা ফিরে আসবে এটা তার বিশ্বাস না করারই কথা।

দুই বছর পর যশোর থেকে জাহানাবাদ সেনানিবাস খুলনায় বদলি হয়ে গেছি। একদিন আমার স্ত্রী আমায় বললো, দুল পরতে এখন আর আমার ইচ্ছা করে না।

কারণ জানতে চাইলে সে বললো, এখন আর কেউ দুল পরে না। এখন *সাগরিকা*-র যুগ।

আমাকে কি করতে হবে? আমি বললাম।

খুলনায় দুলাল নামে এক স্বর্ণকার আছে। সে খুব ভালো মানুষ। ঠিক গোপালদার মতো।

আমিও খোজ নিয়ে জানলাম, দুলালদা এতোটা ভালো যে ভগবানকে শুধু চেনেই না, জানেও।

শেষে একদিন স্ত্রীকে নিয়ে দুলালদার ওখানে পৌছালাম এবং গোপালদার বানানো দুলের জোড়াটা তার প্রতি বাড়িয়ে দিলাম।

ওটা হাতে নিয়ে দুলালদা বললেন, একি দাদা! এতে যে এক রত্তি স্বর্ণও নেই।

আমি যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পড়লাম। একি বলছেন দুলালদা। আমি যে দুল যশোরের গোপালদাকে দিয়ে বানিয়েছিলাম। গোপালদা যে ভগবানকে চেনে। আমার এতো বড় বিশ্বাসে গোপালদা আঘাত দিলেন। তাহলে কি গোপালদা আসলে ভগবানকে চেনে না! যেটুকু বলা শুধু কি ব্যবসা আর ব্যবসার জন্যেই বলা!

রাতে বার বার শুধু মনে হলো, সেই দালালের চেয়ে গোপালদা-ই বা কম কিসে। কোনো স্বর্ণকারের ওপর আমার বিশ্বাস ছিল না সেই তো ভালো ছিল।

গোপালদার মতো লোকদের এমন সব কথা শোনার পর আমার এক বন্ধু মিজান বলে, এমন কথা সবাই বলে। লোকটা উগ্র মোটা বুদ্ধির মানুষ বলে তার কথা হেসে উড়িয়ে দিতাম। আজ বড় দুঃখে মিজানকে মনে পড়ছে। কারণ মিজানের সঙ্গে আরো আগে পরিচয় হলে হয়তো গোপালদের মতো লোকের কাছে আমাকে ঠকতে হতো না। মাঝখানে অবিশ্বাসের মাঝে বিশ্বাসের অংকুরও গজাতো না। সেই তো ছিল ভালো!

সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা থেকে

মিথ্যার জাল

- এল. চৌধুরী

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমি তখন এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। বয়সটাই এমন যে, সব কিছুতেই অতি উৎসাহ। ক্ষুদ্রতেই আনন্দ আবার ক্ষুদ্রতেই দুঃখ।

অনেকের হাতে মোবাইল ফোন দেখে আমারও মনে হতো, ইশ, যদি একটা মোবাইল থাকতো, আমার স্বপ্ন তখন একটাই, মোবাইল ফোন। দিন-রাত আম্মুর কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে কানের পোকা নড়িয়ে অবশেষে পেলাম বহু প্রত্যাশিত জিনিসটি।

মোবাইল নেয়ার কিছু দিন পর খালাতো বোন একটা নাম্বার দিয়ে বললো, আপু, ও আমার খুব ভালো বন্ধু, তুমিও তার সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করো।

খুব সংকোচের সঙ্গে ফোন করলাম। কিন্তু কণ্ঠ শুনেই লজ্জায় রেখে দিলাম।

এরপর সে ফোন করলো। ধরবো না, ধরবো না, করেও ধরে ফেললাম। খুব সংকোচের সঙ্গে কথা বললাম। কিছুক্ষণ। তার অমায়িক ব্যবহারে কিছুক্ষণের মধ্যেই সকল সংকোচ হাওয়ার উবে গেল। তার সুন্দর বাচনভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পরিচিত হলাম একে অপরের সঙ্গে। নাম জানলাম রাজীব। রাজশাহী বিআইটি-তে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ফোর্থ ইয়ারে পড়ছে।

বন্ধুত্ব তৈরি হলো। তার মতো চমৎকার বন্ধু পেয়ে যেন ধন্য হলাম। কথা হতো নিয়মিত। প্রথম দিকে সপ্তাহে এক দুইবার। ধীরে ধীরে তা প্রতিদিন গড়ালো। একটা সময় এমন অবস্থা হলো যে, একদিন কথা না বললে ভালো লাগে না। পড়াশোনাসহ অন্য কিছুতেই মন বসাতে পারি না। সারাক্ষণই মনে হতো কখন সে ফোন করবে। বুঝলাম ভালোবেসে ফেলেছি।

ধীরে ধীরে তার সব কথা জানলাম। পৃথিবীতে তার বাবা-মা, ভাই-বোন কেউ নেই। এক রোড অ্যাকসিডেন্টে বাবা-মা ও একমাত্র ছোট ভাই মারা যায়। রাজশাহীতে সে একাই থাকে। পড়াশোনার পাশাপাশি বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করে।

তার একাকীত্বের কথা জানতে পেরে তার প্রতি আরো দুর্বল হয়ে পড়লাম। কিন্তু তাকে জানাতে সাহস পেলাম না পাছে আবার প্রত্যাখ্যাত হই এই ভয়ে।

অবশেষে একদিন রাজীবই জানালো, ভালোবাসে আমাকে।

শুনে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। স্বপ্নের মতো লাগছিল সব কিছু। নিজেকে পাখির পালকের মতো হালকা মনে হলো যেন সুখের সমুদ্রে খেলারত কোনো চঞ্চল ডলফিন আমি।

আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, তখন পর্যন্ত আমরা কেউ কাউকে দেখিনি।

এর কিছু দিন পর সে দেখা করতে চাইলে প্রথমে রাজি হলাম না।

পরে তার চাপাচাপিতে রাজি হলাম।

সে রাজশাহী থেকে এলো।

গুলশান পার্কে প্রথমবারের মতো দেখা করলাম আমরা।

তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আরো গভীরভাবে ভালোবাসলাম তাকে। তার একাকী থাকার কথা শুনে, কষ্টের কথা ভেবে কখনো কখনো নীরবে কাদতাম আর স্বপ্নের জাল বুনতাম। ভাবতাম বিয়ের পর সার্বক্ষণিক তার পাশাপাশি থাকবো, ঘুচিয়ে দেবো তার সকল দুঃখ, কষ্ট আর একাকীত্ব।

কষ্ট পাবে ভেবে কখনো বাবা-মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করতাম না তাকে। তার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করতাম মনে-প্রাণে। এভাবেই চললো সাত মাস। এরই মাঝে দেখা হলো চারবার।

মাঝে মধ্যে তার বন্ধুদের সঙ্গে কথা হতো। এমনিভাবে একদিন তার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময় কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করলাম, রাজীবের বাবা-মা কিভাবে মারা গেছেন?

আমার প্রশ্ন শুনে তো তিনি হতবাক! রাজীবের বাবা-মা মারা গেছেন, এ কথা তোমাকে কে বললো?

বললাম, ওই তো বলেছে।

এ কথা শুনে তিনি প্রচণ্ড বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, রাজীবের বাবা-মা তো মারা যাননি। বেচে আছেন। ও মনে হয় তোমার সঙ্গে দুষ্টুমি করেছে।

এ কথা শুনে আমার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠলো। সব কিছু ঝাপসা হয়ে এলো। আর কোনো কথাই আমার কানে ঢুকছিল না। নিজের বাবা-মাকে নিয়ে রাজীব এতো বড় প্রতারণা করলো আমার সঙ্গে! এর নাম

কি দুষ্টুমি? কোন শ্রেণীর দুষ্টুমি এটা? কি ধরনের মানসিকতার অধিকারী হলে মানুষ অন্যের সিমপ্যাথি পাওয়ার জন্য নিজের জীবিত পিতা-মাতাকে মৃত বলতে দ্বিধা করে না? এ কোন পশুকে ভালোবাসলাম আমি? এসব প্রশ্ন কুরে কুরে খাচ্ছিল আমাকে।

একটু ধাতস্থ হয়ে তার কাছে রাজীবের সমস্ত কথা শুনে পাথর হয়ে গেলাম। দুঃখ, হাসি, কান্না কোনো বোধই আর কাজ করছিল না। পড়াশোনা. ব্যবসা প্রতিটি বিষয় নিয়ে আমাকে সে মিথ্যা বলেছে। কোনো এক রাজনৈতিক দলের স্থানীয় ক্যাডার সে। আমার সঙ্গে ভালোবাসা সংক্রান্ত প্রতিটি কথাই ছিল তার অভিনয়। আরো অনেক মেয়ের সঙ্গে তার এ রকম সম্পর্ক আছে।

সব কিছু শোনার পর ভালোবাসা ছাপিয়ে জন্ম নিল তীব্র ঘৃণা। ভেবেই পেলাম না আমার মতো সরল মেয়েদের ঠকিয়ে তার কি লাভ? নাকি কোনো ধরনের বিকৃত মানসিকতাসপন্ন মানুষ সে!

সবশেষে পাঠিকাদের বলছি, কাউকে ভালোবাসার আগে তাকে ভালোভাবে জেনে নিন। তা না হলে হয়তো সুন্দর চেহারা আর মিষ্টি কথার মোহে পড়ে প্রতারিত হবেন আমারই মতো।

পূর্ব বাসাবো, ঢাকা থেকে

অন্ধকার

সাবুর বাবা-মায়ের পছন্দে আমাদের বিয়ে হলো ১৯৯৭ শেষের দিকে। বিয়ের দ্বিতীয় দিনই বুঝতে পারলাম সাবুর সঙ্গে প্রেম ছিল মামাতো বোন মুনমুনের। তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কও ছিল।

যাহোক, ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! বিয়ের পর চলে গেলাম লন্ডনে। সেখানে স্কুলের চাকরি, টিউশনি, বাজার করা, সময় পেলে বেড়াতে যাওয়া - এভাবেই দিন কাটছিল আমার।

এরই মধ্যে বুঝতে পারলাম, আমার বান্ধবী নাসরিনের প্রতি চোখ পড়েছে সাবুর। সময় অসময়ে তাকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া, শপিং, সিনেমা, সব জায়গায় খোলামেলা ঘুরতো সাবু। এ নিয়ে বন্ধুরা আমাকে বিচার দিতো। এভাবে পাচ মাস যাওয়ার পর বুঝতে পারি আমি অন্তঃসত্ত্বা। আমার সে কি আনন্দ! বন্ধুরা এ খবর শুনে মিষ্টি নিয়ে আসে সবাই।

কিন্তু আমার প্রাণ প্রিয় আদরের সাবু বেকে বসেছে। এই সন্তান সে রাখবে না। সে সংসারই করবে না।

বহু কষ্টে চার মাস পার করার পর সাবুকে বলি, যদি আমার এমআর করতেই হয় তাহলে আমাকে বিষ খাওয়াও, আমিও মরে যাবো। এই পৃথিবীতে মেয়েরা বাবা-মায়ের বাড়ি পর করে চলে যায় স্বামীর বাড়িতে। স্বামীই সব কিছু। সাবুই আমার সব কিছু ছিল। সেই স্বামী যদি পর হয়ে যায়, তার সন্তান সে মারতে চায়, আমাকে ছেড়ে যেতে চায় তবে কাকে নিয়ে বাচবো, বলো? এদিকে আমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় দেয়ার জন্য সে বিষাক্ত আটটি ট্যাবলেট পানিতে গুলিয়ে দিল। আমাকে ও আমার পেটের সন্তানকে শেষ করার জন্য।

আমি মা-বাবা, ভাই-বোনের সঙ্গে বাংলাদেশে কথা বলেছি এটাই শেষ কথা। তারাও বুঝতে পারছিল যে, সাবু আমাকে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন করে।

আটটি ট্যাবলেট খাওয়ানোর সময় তার হাত একটুও কাপেনি। একটুও চোখের পানি ফেলেনি। ট্যাবলেটের কভারগুলো সে বিয়ারের ক্যানের ভেতরে ফেলে দিল যেন কেউ খুজে না পায়।

এই ওষুধ খাওয়ার পর জ্ঞান হারাই। যখন জ্ঞান ফেরে তখন আমি নিউকাসলের ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে। পুলিশের ভয়ে সে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। বিদেশে আমার কোনো আত্মীয় ছিল না যে, আমি একটু সাহায্য চাইবো। আমার বাচ্চা আমার পেটে মরে আছে। আমি তার সাক্ষী। একটি অসহায় মেয়ে। যে

কিনা স্বাধীন ভাবে একটি সন্তান প্রসব করতে পারবো না, সে কি না একটি নারী লোভী স্বামীর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না।

সেই ১৯৯৯ সালের কথা। তাকে আমি আর আপন করতে পারলাম না। সে লোক দেখানো অনেক কেঁদেছিল আমার জন্য। জানি সে এক নারীতে সুখী না। সে সংসার করতে পারবে না। তাকে ছেড়ে চলে এলাম বাংলাদেশে।

বাবা-মা বলেন তারা মরে গেলে কে দেখবে আমাকে!

আবার বিয়ে করতে হলো। কিন্তু আমি কোনো সংসার করার চিন্তাই করতে পারি না। তবুও আবার সংসার করার জন্য বিয়ে করি। জানি না আমার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর কোনো অনুভব আছে কি না। সে তার আগের মৃত স্ত্রীকেই সারাক্ষণ কল্পনা করে। তার দুটি বাচ্চাকে সে আদর করে। কিন্তু আমাকে সে আদর করে না। সে সংসারের দায়দায়িত্ব বাড়ি কাজের লোকদের বুঝিয়ে দেয়। তবুও আমার সঙ্গে কথা বলে না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার সঙ্গে হাসি-খুশি, আমার সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগে না। এমনকি শারীরিক সম্পর্কও করতে চায় না। কারণ যদি বাচ্চা হয়ে যায়!

যদি আমি বাচ্চা নিতে বলি। সে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে, শারীরিক নির্যাতন করে।

যদি বাবার বাড়ি চলে যাই, সে একবারও খবর নেয় না।

কি নিয়ে আমি বেচে থাকবো। কার জন্য আমি বেচে থাকবো!

এই বাড়ির ছোট বাচ্চার কাপড়, খেলনা ধরলেই আমার মৃত বাচ্চার কথা মনে হয়। সাবুর কথা মনে হয়। আমার মাত্র নয় মাসের সংসারে কথা মনে হয়। বারান্দায় বসে জ্যোৎস্না রাতে হু হু করে কাদি। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে। এই পর্যন্ত বারোটি ঈদে আনন্দ করতে পারিনি। প্রতি রাত আমার ঘুম হয় না। মনে হয় আমার বাচ্চা মৃত অবস্থায় আমাকে ডাকছে। সাবু, আমার জীবনটা অন্ধকার করে গেলে কেন তুমি? জানি, এই সময় তুমিও আমাকে খুব মিস করছো। তোমার ফোন পেলে আমি অতীতের দিনগুলো মনে হয়। তুমি বলেছো, আমাকে কানাডায় নিয়ে যাবে আবার সংসার করবে।

কিন্তু তোমাকে আমার ভালো লাগে না। প্লিজ, তুমি আমাকে আর বিরক্ত করো না। স্বামী, সংসার কি জিনিস আমি জানি না। প্রেম, আদর, ভালোবাসা পাইনি, পেতেও চাই না। আমি এখন মৃত্যুর প্রহর গুণছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক